হেম-হার।

(স্বপ্ন, অদ্ভুত প্রত্যুপকার, অদৃষ্ট, সংসার ও সন্ন্যাস, লোক-চেনা,

ঈশ্বর মঙ্গলময়, মঙ্গল ও অমঙ্গল, পূর্ণচন্দ্র,

ভক্তি ও ভক্ত এবং যমুনা।)



শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।



প্রকাশক—শ্রীহেমচন্দ্র বসু,

১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



ফাল্গুন, ১৩০২।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

কলিকাতা

২০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কালিকা যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

পরম প্রীতিভাজন, সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মহাশয়কে,

তদীয় দরিদ্র বন্ধুর

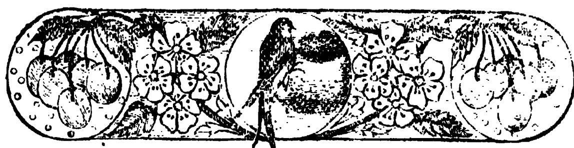
এই সাহিত্য-সম্বল

“হেম-হার”

আন্তরিক প্রীতিসহকারে

উপহার

প্রদত্ত হইল।



হেম-হার

স্বপ্ন।

(১)

আজ কয়েক বৎসরের কথা বলিতেছি,—ভাগীরথীতীরস্থ দেবীগ্রামে রাধারমণ রায়ের বাড়ী ছিল। বাড়ীটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা হইলেও পুণ্যবানের অট্টালিকা ছিল না। এখন সে অট্টালিকার অস্তিত্বও নাই।

ভাগীরথীতীরের নিকটবর্ত্তী, তৃণপুষ্পসমাচ্ছন্ন একখানি সুন্দর মাঠ। মাঠের এক প্রান্তদেশে রাধারমণের এই বাড়ী অবস্থিত। এই মাঠে কখন কোনরূপ চাষ হইত না,—বরাবর ইহা এই ভাবে পড়িয়া থাকিত। গ্রামের বালকেরা বেলাবসানে, এই প্রীতিপ্রদ সুন্দর মাঠে সমবেত হইয়া, নানাপ্রকার ক্রীড়া করিত, গান গায়িত, গল্প বলিত। বালকগণের আনন্দকোলাহলে প্রতি অপরাহ্ণে, সে মাঠ পরিপূর্ণ হইত। সন্ধ্যাগমে, সকলে গৃহে ফিরিত। নির্জ্জন মাঠের মাঝে দাঁড়াইলে, ভাগীরথীর শ্রুতিমধুর জলকল্লোল শুনা যাইত।

একদিন একটি বালক, সেই মাঠের পার্শ্বে, ভাগীরথীর কূলে বসিয়া, বড় আকুলপ্রাণে কাঁদিতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অতি কষ্টে চতুর্থীর চন্দ্র উঠিয়াছে। পৃথিবীর গায়ে ঈষৎ, অস্ফুট জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। আর কোথাও কেহ নাই, একাকী এই বালক তীরে বসিয়া কাঁদিতেছে। শ্রাবণ মাস, ভাগীরথীর কূলে কূলে জল। বৈকালে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে,—পথ বড় পিচ্ছিল।

অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া, বালক কাঁদিল। চক্ষু মুছিয়া একবার চারিদিক চাহিল। কেহ কোথাও নাই। গঙ্গার পানে একবার দেখিল,—অতি দূরে যেন একখানা পান্সীর মত কি ভাসিতেছে। ভাবিল, তাহার দাদা ফিরিয়া আসিতেছে। একাকী থাকিয়া একটু ভয় হইতেছিল, এখন সে ভয় টুকু কমিল।

বালক ভাবিতে লাগিল, "আমি দাদার কি করিয়াছি? আমাকে কেন তিনি ভাল বাসেন না? আমি ত তাঁহাকে এত ভাল বাসি, তবে কেন তিনি আমার উপর এত রাগ করেন?"

বালক আবার কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভাবিল, "দাদা আমাকে কত মারিয়াছেন, আমি পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়াছি! তাঁহাকে ত আমি কখন কিছু বলি নাই। তবুও তিনি আমাকে দেখিতে পারেন না, কাছে গেলে তাড়াইয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে খেলিতে চাহিলে, খেলেন না। কোথাও যাইলে আমাকে ডাকেন না,—আমি ত কিছুই করি নাই! আমার মা নাই,—দাদার কাছে না যাইয়া কার কাছে যাইব? দাদার কাছে না শুইলে আমার ঘুম হয় না,—দাদা কিন্তু কাছে

শুইতে দেন না। পাল্কী করিয়া বেড়াইতে গেলেন, আমাকে সঙ্গে লইলেন না। আমাকে একেলা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বাবা কেন আমাকে দাদার সঙ্গে পাঠাইলেন? আমার যে বড় ভয় করিতেছে! কৈ, দাদা ত এখনও এলেন না? সে পাল্কীই বা কোথায় গেল? মাগো, তুমি কোথায়?"

উচ্চৈঃস্বরে বালক কাঁদিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার বড় ভয় হইল। বড় ভয়ে মাতৃহারা শিশু কাঁদিয়া উঠিল,—"মা, মা, কোথায় তুমি? কোলে তুলিয়া নাও মা! আমার যে বড় ভয় করিতেছে!"

কাঁদিতে কাঁদিতে বালক গৃহাভিমুখীন হইয়া দৌড়িল। কিছুদূর গিয়া পিচ্ছিল পথে একবার আছাড় খাইল। তারপর কষ্টে সে স্থান হইতে উঠিয়া এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইল।

---

(২)

শ্রাবণ মাসের সেই ভরা গঙ্গাকূলে, নির্জ্জন মাঠ করুণকণ্ঠে পূর্ণ করিয়া, ভীতিবিহ্বল বালক আছাড় খাইয়া এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। ভয় আরও বাড়িল। তখন একেবার জ্ঞানশূন্য হইয়া, সে, মৃতবৎ সেখানে পড়িয়া রহিল।

অনেকক্ষণ এই অবস্থায় গেল। সেই অবস্থাতেই বালক ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল।

বালক দেখিল, আকশে বড় মেঘ, বড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হঠাৎ বড় একটা বিদ্যুৎ দেখা দিল। বিদ্যুৎ তখনই নিবিয়া গেল না। বালক হাসিয়া উঠিল। দেখিল, সেই বিদ্যুতের

ভিতর একটি ছোট,—খুব ছোট,—বড় সুন্দর বালিকা বাহির হইয়া, বালকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কি সুন্দর মুখ! বালক বিস্মিত হইয়া, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বালিকার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "তুমি কে? আমার সঙ্গে খেলা করিবে?" বালিকা বড় মধুর হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। তখন হাতে হাত দিয়া বড় প্রফুল্ল প্রাণে বালক বালিকা সেই গাঢ় অন্ধকারাবৃত পৃথিবী মাঝে, সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে খেলিতে লাগিল। বালিকার চঞ্চল কেশদাম বায়ুভরে উড়িতে লাগিল, সুন্দর রূপের ছটা অন্ধকার আলো করিল।

এইবার বিদ্যুৎ নিবিয়া গেল। বালক দেখিল, সে যেন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া বাত্যান্দোলিত বিশাল গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছে,—বালিকা তীরে দাঁড়াইয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে। বালিকা কাতরকণ্ঠে বলিল, "সাবধানে এস, বড় ঢেউ উঠিয়াছে!" নৌকা ফিরিল না, গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গেল।

চীৎকার করিয়া বালক জাগিল। চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে, আকাশে একটু একটু করিয়া অনেক মেঘ জমিয়াছে, শীতল বাতাস বহিতেছে।

---

(৩)

সকলেই বলে, রাধারমণ রায় লোক ভাল ছিল না। পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, সে বড়মানুষ হইয়াছিল। সে কথা ঠিক কি না, আমরা বলিতে পারি না; তবে শুনিয়াছি, রাধারমণের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, সতী সাধ্বী ভার্য্যা স্বামীর আচরণে

ব্যথিতা হইয়া, অতি অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গ্রামের লোকে বলিয়া থাকে, এমন পাষণ্ড স্বামীর হাত এড়াইয়া, সতী জুড়াইয়াছে।

রাধারমণের দুইটি মাত্র পুত্র। যখন তাহারা মাতৃহারা হয়, তখন তাহাদের বয়ঃক্রম যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বৎসর মাত্র। অন্যান্য আত্মীয়বর্গে গৃহ পূর্ণ ছিল, কিন্তু মাতৃহারা শিশু দুইটির কেহ বড়-একটা যত্ন লইত না। পিতা নিজেই যখন তাহাদের মুখপানে চাহিতেন না, তখন অপরে কেন চাহিবে?

ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, তবু তাহারা মুখ ফুটিয়া সে ক্ষুধার কথা কখন বলিতে পায় নাই,—বলিলেও কাহারও-না-কাহারও কাছে ধমক খাইয়াছে! কোন জিনিসে যদি কখন অভিলাষ হইয়াছে, সে অভিলাষ মনেই লুকাইতে হইয়াছে। কাহার কাছে বলিবে? কে দিবে? এমনই অবস্থায় তাহারা বর্দ্ধিত হইতেছিল।

তাই কি ছাই বড়টি ছোটটির মুখপানে চাহিত? কে জানে কেন, সে, ছোট ভাইটিকে দেখিতে পারিত না। ছোট-টির আর কে আছে? দাদাকে ভিন্ন সে আর কাহাকে জানে কিন্তু দাদার আচরণ বড় নিষ্ঠুর। পাঠক, পূর্ব্বেই তাহার [illegible] আভাস পাইয়াছেন।

বড় হইয়া জ্যেষ্ঠ মন্মথ পিতৃ-স্বভাব প্রাপ্ত হইল। তাহাতে সে, পিতার বড় স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। নানাপ্রকার কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে তাহার দিন কাটিত। পিতার পরামর্শে লোকের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া, মোকদ্দমা চালাইত; হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও গৃহ দগ্ধ করিয়া দিত, কাহারও স্ত্রী

কন্যাকে কুলত্যাগিনী করাইয়া, কুলে কালি দিত। লেখা পড়ার কাছ দিয়া সে কখনও যায় নাই।

ছোট ভাই প্রমথ অতি নিরীহ ভালমানুষ। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার সে নিরীহ প্রকৃতির শোভা বড়ই মনোহারিণী হইল। পিতার অযত্নে তেমন কিছু লেখা-পড়া শিখিতে পান নাই, কি তাহা হইলেও স্বাভাবিক সরলতায় তিনি সকলকে মুগ্ধ করিতেন। তবে তাঁহার বড় দুঃখ, একদিনের জন্যও তিনি পিতা কি অগ্রজের স্নেহ-আশীর্ব্বাদ পান নাই। অনেক সময় মন্মথ প্রমথকে কষ্ট দিয়াছে; কিন্তু গ্রামের লোক কখন বলে নাই যে, প্রমথ সে জন্য জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধাশূন্য হইয়াছে।

যথাসময়ে রাধারমণ, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। বিস্তর অর্থ পাইবার লোভে তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। এক সঙ্গতিপন্না বিধবার একটি মাত্র কন্যা ছিল; তাহার সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সে সকলই এই কন্যার। রাধারমণ সেই কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিলেন।

---

(৪)

কনিষ্ঠ প্রমথ এই সংসারে থাকিয়া কখন সুখী ছিলেন না। তিনি দেখিতেন,—দেখিয়া বুঝিতেন, তাঁহাদের সংসার পাপে ভরা। সে জন্য তিনি সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ থাকিতেন। দিন দিন কেমন হইতে লাগিলেন। যেন বড় ব্যাধিগ্রস্ত; যেন আর অধিক দিন বাঁচিবার আশা নাই। তাঁহাদের সংসার সুখ-শান্তিহীন,

পাপের পসারা,—সুতরাং তিনিও লক্ষ্যশূন্য, আশাশূন্য, বড় দুঃখী। তাঁহার অন্তরের কথা সেই অন্তরের দেবতাই জানিতেন।

আর একজন ছিল, সেই জানিত। একটি অনেক দিনের বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। প্রমথকে সে বুড়া বড় ভাল বাসিত। সে কোলে পিঠে করিয়া, ভাই দু'টিকে এত বড় করিয়াছে। বড়টি এখন তাহাকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায়ই অবজ্ঞা করে, ছোটটি কিন্তু তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করে। সেই নিরক্ষর ভৃত্য,—ভগবান্ বলিতে পারেন, সে রক্তমাংসের দেহের ভিতর কি অমূল্য হৃদয়ই তিনি দিয়াছেন,—সেই নিরক্ষর ভৃত্য আপন পুত্রের ন্যায় প্রমথকে বুকে করিয়া রাখিত। বৃদ্ধ মনে করিত, তাহার বুকের ভিতর রাখিলে, বুঝি, পাপসংসারের পাপ উত্তাপ প্রমথকে স্পর্শ করিতে পারিবে না!

এই সময়ে রাধারমণ কনিষ্ঠ পুত্রেরও বিবাহ দিলেন। প্রমথ অনিচ্ছা সত্বেও বিবাহ করিলেন। কিন্তু বিবাহ করিয়া বুঝিলেন, ভালই করিয়াছেন,—পাপের সংসারে তিনি পুণ্যের মূর্ত্তি দেখিলেন। অন্ধকারময় জীবনে তিনি ধ্রুবনক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। সেই অনেক দুঃখের মাঝেও দুই জনে দুই জনার মুখ চাহিয়া বুঝিতেন, সংসারে এমন কি দুঃখ কষ্ট আছে, যাহা আমরা সহ্য করিতে না পারি!

মন্মথের ভাগ্যে কিন্তু অন্যরূপ হইল। তিনি যে ধাতুর লোক, তাঁহার ভার্য্যা সেরূপ হইলেন না। পুণ্যে ভক্তি, পাপে অশ্রদ্ধা, সর্ব্বজনে প্রীতি, স্বার্থে ঘৃণা,—পতি-পরায়ণা সতী সাধ্বী মন্মথের চক্ষুঃশূল হইল। পাপিষ্ঠ বিনা কারণে সরলা সহধর্ম্মিণীকে কষ্ট দিত। এই সময়ে রাধারমণের মৃত্যু হইল।

(৫)

রাধারমণ কোন প্রকার উইল করিয়া যান নাই। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে একদিন মন্মথ, প্রমথকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ সংসার এখন আমার। বাবা আমাকে সব দিয়া গিয়াছেন। আমি যাহা করিব, তাহাই হইবে। এখান হইতে তোমার অন্নজল উঠিল। এখন তুমি পথ দেখ।"

প্রমথ ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে, শ্রাবণে, ভাগীরথীকূলে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে, অন্ধকার পৃথিবী বক্ষে, আছাড় খাইয়া, বৃক্ষতলে পড়িয়া একদিন যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, জীবনে একদিনের জন্যও তাহা ভুলিয়া যান নাই। আজ তাহা মনে পড়িল। আজও যেন দেখিলেন, আকাশে বড় মেঘ, বড় অন্ধকার! বড় জোরে তাঁহার একটি নিশ্বাস পড়িল।

তখন নিজগৃহে গেলেন। দেখিলেন, দ্বারদেশে এক স্বর্গভ্রষ্টা, প্রেমপ্রতিমা, মোহিনীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। অতীতের সেই স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা-মূর্ত্তি মনে পড়িল।

বড় দুঃখে বহুক্ষণ ধরিয়া দম্পতিযুগল কাঁদিলেন। শেষে স্থির করিলেন, এ পাপ-পুরী ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। প্রমথ ভাবিলেন, "অর্থই কি এত বড় হইল? মার-পেটের ভাই হইয়া যদি একজন আর একজনকে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিতেই পারে, তবে তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া ভোগসুখে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা, ভিক্ষান্নে দিনযাপন করা সহস্র গুণে ভাল।"

সেই দিনই অসাহায়ে, নিরুপায়ে, একটি চারি বৎসরের পীড়িত শিশু লইয়া, দম্পতিযুগল গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন।

অন্ধকার রাত্রি। পৃথিবী নীরব। পেচক ডাকিয়া উঠিল,—দম্পতিদ্বয়ের চরণে কে যেন বাধা দিতে লাগিল।

মাঠ পার হইয়া সেই গঙ্গাকূলে আসিলেন। কল্লোলিনীর কি মনোরম মূর্ত্তি! সেই অনন্তবিস্তৃত আকাশতলে, সেই নীরব রজনীতে, চারিদিকে প্রকৃতির কি শান্ত মূর্ত্তি! সব সুন্দর, সব শোভাময়!—হায়, নর-হৃদয় কি কুৎসিত!

প্রমথনাথ পিছনে চাহিয়া দেখিলেন, কে আসিতেছে। আগন্তুক নিকটে আসিলে চিনিলেন, সেই বৃদ্ধ ভৃত্য। বিস্মিত হইয়া ভগ্নস্বরে প্রমথনাথ জিজ্ঞাসিলেন, "কে?—তুমি! কেন আসিয়াছ?—কোথায় যাইবে?"

বৃদ্ধের চক্ষে জল। সে কথা কহিতে পারিল না। পীড়িত চারি বৎসরের শিশুটিকে তাহার মাতার ক্রোড় হইতে লইয়া আপন বক্ষে রাখিল। শিশু-মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কোথায় যাইবে?"

এবার বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মা লক্ষ্মী আমার! তোমরা কোথায় যাইবে? আমি যে সব শুনিয়াছি! আমাকে এই নরকের ভিতর রাখিয়া তোমরা যাইতেছ? মা, তোমরা যেখানে যাইবে, আমিও সেইখানে যাইব!"

পতিব্রতা, গদ্গদকণ্ঠে পতিকে কহিলেন, "স্বামিন্! আমরা আজিও পিতৃহীন হই নাই।"

বৃদ্ধ, তখন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "চল মা! দুঃখের উত্তাপ হইতে আমি বুক দিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিব।"

---

(৬)

দেবীগ্রামের কিছু দূরে ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া, প্রমথ স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পাপের বাতাস সেখানে কখন বহিত না ; পুণ্যের স্নিগ্ধকিরণে সে কুটীর শান্তিময় ছিল। প্রমথ স্বপ্ন-বিবরণ মনে করিয়া ভাবিলেন, "বিদ্যুৎ এখনও নিবে নাই।"

ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে কিছু জমি লইয়া, প্রমথ তাহাতে চাষ করিতেন, বৃদ্ধ সেই চাষের শস্যাদি লইয়া বাজারে বিক্রয় করিত। তাহারই আয়ে ক্ষুদ্র পরিবারের ক্ষুদ্র সংসার সুখে চলিত। পীড়িত শিশুটি কিন্তু কি পীড়া লইয়াই আসিয়াছিল,—সে আর বাঁচিল না।

১২৯৫ সালে একবার তিন দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল। মাঠ জলে ভরিয়া গেল। চাষ-বাস সব মাটী হইল। প্রমথনাথ সে জল-বৃষ্টি না মানিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সেই মাঠে অঙ্কুরিত শস্য-বীজ রোপণ করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রমে ও অত্যন্ত কষ্টে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন।

সে বৎসর বঙ্গের গ্রামে গ্রামে মন্বন্তর হইয়াছে। দোকানী দোকানপাট বন্ধ করিয়াছে। চারিদিকে হাহাকার। "হা অন্ন যো অন্ন" রবে বঙ্গভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভিখারী ভিক্ষা পায় না। চোর-ডাকাতের উপদ্রব দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

পীড়িত প্রমথনাথের আর পথ্য চলে না ; অবস্থা এমনই দাঁড়াইল। তখন সেই বৃদ্ধ ভৃত্য, গ্রামান্তরে, তাহার এক আত্মীয়ের নিকট হইতে কিছু কর্জ্জ করিয়া আনিল এবং সেই টাকা কয়টি প্রভু-পত্নীর হস্তে দিল।

এত কষ্টেও গৃহলক্ষ্মীর মনে অশান্তি নাই। পীড়িত স্বামীকে

সর্ব্বদাই তিনি প্রফুল্ল রাখিতেন। কোন অভাব জানিতে দিতেন না। এমন কত দিন গিয়াছে,—নিজে না খাইয়া, চাল কটি তুলিয়া রাখিতেন, পরদিনের ভাবনা ভাবিতেন।—সে চাল কটির বিনিময়ে স্বামীর পথ্যসংগ্রহ করিতেন।

হায়! তবুও ত স্বামী রক্ষা পাইলেন না। মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া, সহধর্ম্মিণীকে ডাকিলেন। অন্তরের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া, চিরানন্দময়ীবেশে সতী, স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। স্বামী সে কোমল হাতখানি আপন হাতে রাখিয়া, অতীতের সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন স্মরণ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"প্রাণাধিকে! আর লুকাইও না। আমি তোমার ঐ করুণ আঁখির ভিতর দিয়াই বুঝিতেছি, তোমার অন্তরে কি যন্ত্রণাই হইতেছে! সতি! আমি দেখিতেছি, আজ সে বিদ্যুৎ নিবিয়াছে। আমি বাত্যান্দোলিত বিশাল গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছি, তুমি তীরে দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া আছ!"

সতী, বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "স্বামিন্! ভয় কি? আমি বড় দুঃখিনী, কিন্তু বিধাতা আমায় চরণে রাখিবেন!"

আব্‌ছায়া দিবালোকে, ছিন্ন মেঘের কোলে, ক্ষীণ বিদ্যুতের মত একটু ম্লান-হাসি হাসিয়া স্বামী কহিলেন, "হায়! সেই বালিকামূর্ত্তিও তীরে দাঁড়াইয়া একদিন বলিয়াছিল,—'সাবধানে এস, বড় ঢেউ!' প্রাণাধিকে! তোমাতেও আজ সেই মূর্ত্তি দেখিতেছি!—তোমার স্বরেও আজ সেই স্বর শুনিতেছি!"

* * * * *

নৌকা ডুবিল! সতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

(৭)

আশ্রয় নাই, সহায় নাই, কোনরূপ অবলম্বন নাই,—দুঃখিনার দিন কাটে কিরূপে? কুটীরে একাকিনী তিনি কেমন করিয়া থাকেন? অনেক দিন থাকিয়াছেন, আর থাকিতে পারেন না! পিশাচের কুটিল নয়ন কাঙ্গালিনীর সেই কুটীর প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে।

বৃদ্ধ বলিল, "চল্ মা! তোর শ্বশুর-গৃহে যাই। আমাদের এ দুঃখের দশায়, তাহাদের দয়া হইবে।"

"বাবা, যাঁহাকে লইয়া শ্বশুর-গৃহ, তিনি ত আর নাই,—কাহার কাছে যাইব? পোড়া জঠর-জ্বালা কি এত গুরুতর?"

"না মা, বাঁচিতেই হইবে! যখন সময় আসিবে, সকলেই যাইব। আত্মহত্যায় কাহারও অধিকার নাই। আমি কি মা জানি না, সেখানে আর তোর সুখ নাই? সুখ ত মা, তোর গিয়াছে!—তোর সিঁথীর সিঁদূরের সঙ্গে সঙ্গে তোর সকল আশা-ভরসাও গিয়াছে।—তা জানি।—চল্ মা, তবু তোর স্বামীর গৃহ,—আমি আছি, তোর কোন ভয় নেই মা!"

"বাবা, যখন তুমি বলিতেছ, তখন আমি যাইব। কিন্তু সেখানে যাইতে আমার পা সরিতেছে না। কি জানি, আমার কেমন খারাপ মন,—মন্দটা আগে মনে জাগে। বুঝি—বুঝি বাবা, সেখানে গেলে আমি আর ফিরিব না—তা চল যাই, ভবিতব্য ত রোধ করিতে পারিব না।"

তারপর আপন মনে মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"প্রভু, তুমি এখন স্বর্গে আছ। সেই স্বর্গ হইতে আমার নারীধর্ম্ম রক্ষা করিও।"

(৮)

মন্মথনাথ সস্ত্রীক দেশভ্রমণে যাইতেছিলেন। গঙ্গাবক্ষে সুন্দর নৌকা সজ্জিত। গঙ্গালহরীর তালে তালে নৌকা হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে।

সকলেই নৌকায় উঠিয়াছে। মন্মথ উঠিবার সময় শুনিলেন, তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া, সেই বৃদ্ধ ভৃত্যের সহিত তাঁহার নিকট আসিতেছেন। ব্যাপারখানা কি, জানিবার জন্য, তিনি তীরে একটু অপেক্ষা করিলেন।

অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণী কিছু দূরে গঙ্গার উপকূলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভৃত্য, অগ্রসর হইয়া সকল কথা নিবেদন করিল।

মন্মথনাথ ইতিপূর্ব্বেই সব শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার গৃহে উহাঁর স্থান নাই। আমি এখন সস্ত্রীক দেশভ্রমণে যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া কিছু ভিক্ষা দিব।"

ভৃত্য কাঁদ-কাঁদ-মুখে কহিল, "বড় বাবু, এ দুর্দ্দিনে কিছু ভিক্ষা দিন! আপনার ভ্রাতৃবধূ আজ অনাথিনী, পতি-পুত্র-শোকাতুরা আজ পথের ভিখারিণী! দুঃখিনী মার-আমার যে কিছু নাই, প্রভু!"

কর্কশ কণ্ঠে, ব্যঙ্গস্বরে মন্মথ কহিল,—"কেন, বিক্রয় করিবার জিনিস ত আছে?"

বৃদ্ধ, কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "মার আমার কি আছে?—কি বিক্রয় করিব?"

নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে বিষের বাতাস বহিল। অম্লানবদনে মন্মথ কহিল, "কেন, তোমার মায়ের দেহ আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে,—তাহাই বিক্রয় কর!"

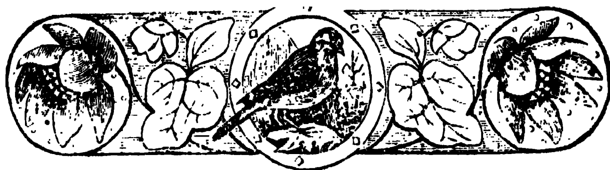
হঠাৎ খুব বড় একটা তরঙ্গ আসিল। যে তরঙ্গ-ভঙ্গ-বাপী-তটে অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণী দাঁড়াইয়া,—প্রচণ্ড তরঙ্গ-তুফানে সে মৃত্তিকাখণ্ড জলে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে সতী-প্রতিমাও ডুবিয়া গেল!

পাষাণভেদী "মা মা" স্বরে দিগ্মণ্ডল কাঁপাইয়া বৃদ্ধও জলে ঝাঁপ দিল!

স্বপ্ন ফলিল।

সমাপ্ত।





অদ্ভুত প্রত্যুপকার।

পরোপকারের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই। এ ব্রত কখন নিষ্ফল হয় না। উপকার করিলেই তাহার প্রত্যুপকার আছে। পৃথিবী যতই কেন পাপভারে আক্রান্ত হউক না, মানুষ যতই কেন অকৃতজ্ঞ ও নীচাশয় হউকনা, উপকারীর প্রত্যুপকার স্বয়ং জগৎ পিতা জগদীশ্বরই করিয়া থাকেন। ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, সহজেই এ কথার সার্থকতা পরিলক্ষিত হইবে। উপস্থিত আখ্যায়িকায় এই ভাবের বিশিষ্ট প্রতিপাদক একটি চিত্র পাঠক দেখিতে পাইবেন।

---

(১)

কোন গ্রামে এক ধর্ম্মভীরু দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহসংসারে তাঁহার একটি মাত্র পুত্র ব্যতীত আর কেহ ছিল না। ব্রাহ্মণ মৃত্যুর সময় সেই পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া যান যে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে যেন ধর্ম্মের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি থাকে; আর এক মাত্র পরোপকারই যেন তাহার জীবনের ব্রত হয়। অধিকন্তু পুত্রকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, "এই ভাবে সংসারক্ষেত্রে

বিচরণ করিলে, তোমার ভাবী জীবন অতি সুখময় হইবে ; এবং কোন একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে, তোমার নাম অক্ষয় অক্ষরে খোদিত থাকিবে ; ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।”

পুত্রকে কাঁদিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সস্নেহে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, “বৎস, কাঁদিও না, পৃথিবীর নিয়মই এই ! চিরদিনের জন্য কেহ এখানে থাকিতে আইসে নাই। ধর্ম্মে মতি রাখিও, সাধ্যানুসারে পরোপকার করিও। বাবা! অনেক কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গেলাম, গৃহের নিম্নে তাহা প্রোথিত আছে। তাহার উপসত্ব হইতে কষ্টে-সৃষ্টে, কোন রকমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিও। পরলোকে তোমার মঙ্গল হইবে।”

যথা সময়ে ব্রাহ্মণ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। যথা-বিহিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ-শান্তি সম্পন্ন করিয়া পুত্র অশৌচ হইতে মুক্ত হইল। বিশ্ব সংসারে এখন আর তাহার ‘আপন’ বলিতে কেহ নাই। কোন প্রকার বন্ধন নাই, অথচ গার্হস্থ্য আশ্রম তাহার নিকট বড়ই অশান্তিময় ও বিরক্তি-কর বোধ হইল। মনপ্রাণ সদাই হু-হু জ্বলিতে থাকে! শিশু বয়সেই তাহার প্রাণ উদাস হইল, মনে বৈরাগ্যের ছায়া পড়িল। তাহার মনে মনে শেষে সন্ন্যাসধর্ম্মের বাসনাই বলবতী হইল। অদম্য সঙ্কল্প শেষে কার্য্যে পরিণত হইতে চালিল। স্বর্গীয় পিতার উপদেশানুসারে, বালক, গৃহের নিম্নদেশ খনন করিল। তন্মধ্যে প্রোথিত দুই শত টাকা পাইল।

সেই দুই শত টাকা লইয়া যথাসময়ে সেই সংসারবিরাগী বালক সন্ন্যাসীবেশে স্বদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ

করিল। অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রজনীতে কাহার উদ্দেশে ঊর্দ্ধপানে চহিয়া মনে মনে কি প্রার্থনা করিল ; সে ব্যক্তিও যেন তাহার প্রার্থনা শুনিল, ইঙ্গিতে য়েন কি আশ্বাসও দিল। বালকের হৃদয়ে তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, দেহে বল আসিল, তাহার মন প্রাণ শান্তি-রসে পরিপ্লুত হইল। আহা, ধর্ম্মভীরু দরিদ্রজীবন কত সুন্দর, কত মনোহর !

---

(২)

বিরাগী বালক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিল। বহুদূর অতিক্রম করিয়া বালক এক ভীষণ শ্মশানের সম্মুখীন হইল। তথায় একটি লোকবিগর্হিত লোমহর্ষণ ঘটনা দর্শনে তাহার হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ; মনে যুগপৎ ক্রোধ, ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব উদয় হইতে লাগিল। বালক শ্মশান মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কয়েক জন লোক একটি শব দাহ করিতে আসিয়াছে। চিতা প্রজ্বলিত, কিন্তু তাহাতে শব নাই,—সে শব ভূমে পড়িয়া আছে, এবং শবদাহকারী ব্যক্তিগণ সেই শবদেহ লইয়া অতি নিষ্ঠুর পিশাচের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। কখনও শ্মশানস্থ অস্থি-কঙ্কাল দ্বারা শবের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিতেছে ; কখনও অতি দুর্গন্ধময় গলিত মাংসপেশী ও মলমূত্র প্রভৃতি ঘৃণাজনক অপবিত্র বস্তু তাহার মুখাবরে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা পাইতেছে, কখনও বা কঠিন বংশখণ্ড দ্বারা শবের সর্ব্বাঙ্গে অতি প্রচণ্ডরূপে প্রহার করিতেছে ! এই হৃদয়-বিহীন নরচর্ম্মাবৃত পশুদিগের অতি বীভৎস পৈশাচিককার্য্য

দর্শনে বালকের হৃদয় ব্যথিত হইল, কম্পিত ও ভীতকণ্ঠে বালক পিশাচদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?—আর এই মৃত ব্যক্তিই বা কে? অকারণ কেন এ মৃত-দেহের প্রতি এরূপ গর্হিতাচরণ করিয়া ইহাকে অপবিত্র করিতেছ?"

রোষ-কষায়িত লোচনে, অতি কর্কশস্বরে তাহাতে এক ব্যক্তি উত্তর করিল,—"তুমি কে হে বাপু! যাও, এখানে মিছে ফ্যাছ্ ফ্যাছ্ ক'র না!"

বালক সন্ন্যাসী উত্তর করিল, "বলিতে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "শুন্‌বে?–তবে শোন! এই ব্যক্তি আমাদের খাতক ছিল। বেটা জীবিতকালে আমাদের নিকট হইতে দুই শত টাকা ধার লয়; কিন্তু তাহা পরিশোধ করিতে পারে নাই। টাকা গিয়াছে, আর তো তাহা পাইবার কোন উপায় নাই। এখন এই রকমে টাকার শোধ তুলি।"

এই বলিয়া সেই নরপিশাচগণ পুনর্ব্বার সেই শবদেহোপরি সেইরূপ গর্হিতাচরণ করিতে লাগিল।

তৃতীয় ব্যক্তি প্রহার করিতে করিতে শবের উদ্দেশে কহিল, "বেটা, এই রকম নাস্তানাবুদ করবার জন্যেইত ঘরের পয়সা খরচ ক'রে তোরে সৎকার করতে এনেছি! এখন ফলভোগ কর্। —কেমন বেটা!"

চারিদিক হইতে সেই শবদেহের উপর আবার প্রহারবৃষ্টি হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, হতভাগ্যের আত্মীয়-স্বজন আর কেহই ছিল না।

দয়ার্দ্রচিত্ত, উদার-হৃদয়, সেই শিশু সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া

দারুণ বেদনা অনুভব করিল। ব্যথিত হৃদয়ে, ভগ্নস্বরে কহিল, "ভাই সব, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও! নিরর্থক 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিবার আবশ্যক কি? উহাকে নিগ্রহ করিলে টাকা তো আর ফিরিয়া আসিবে না। আচ্ছা, ইহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাদিগকে দুইশত টাকা দিতেছি। এখন তোমরা ইহারা যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর।"

এই বলিয়া সেই মহাগুরু পিতৃদেব দীক্ষিত পরোপকারব্রতাবলম্বী সেই বালক তাহাদিগকে সেই সঞ্চিত পিতৃধন দুই শত টাকা প্রদান করিল।

---

(৩)

সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন করায় অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ প্রযুক্ত ঠিক প্রদোষ সময়ে সেই শিশু সন্ন্যাসী এক স্রোতস্বতী তীরে বসিয়া স্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতে লাগিল। পশ্চাতে নিবিড় বন। এই সময়ে সেই মহারণ্য ভেদ করিয়া, দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া অপূর্ব্ব তান লয় গীতিধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। গভীর উদারভাবপূর্ণ সাধনসঙ্গীতে বিমোহিত হইয়া সেই ভক্ত প্রাণ বালক অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছু দূর গিয়া জানিতে পারিল যে, একটি সাধু সন্ন্যাসীর শ্রীমুখ হইতে উক্ত সাধনসংগীত গীত হইতেছে। সম্মুখীন হইয়া বালক গীত সমাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিল। যথা সময়ে গান থামিল। সন্ন্যাসী বালকের যথাবিহিত স্বাগত কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, উভয়ের অনেক কথা হইল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভক্তি ও স্নেহের উৎস খুলিয়া

গেল। অতি অল্পকালের মধ্যে উভয়ের প্রণয় অতি গাঢ় হইল। যেন উভয়েই উভয়ের কতদিনের পরিচিত! বয়সের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও প্রাণের টানে উভয়েই যেন এক প্রাণ হইল।

(৪)

এক বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে বসিয়া এক বৃদ্ধা শতধারে আপন বুক ভাসাইতেছে, এমন সময় আমাদের সেই সন্ন্যাসীদ্বয়, সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। আমরা এখন হইতে ইহাঁদিগকে সত্যব্রত ও সত্যসখা নামে অভিহিত করিব। সত্যব্রত—সেই অরণ্যস্থ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, আর সত্যসখা—আমাদের আখ্যায়িকার শিশু সন্ন্যাসী। বৃদ্ধার পায়ে একটি অতি তীক্ষ্ণ কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল। সত্যব্রত ইহা জানিতে পারিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভিক্ষার ঝুলি হইতে একটি ঔষধ দিলেন। দিবা মাত্রই ঔষধের আশ্চর্য্য গুণে তৎক্ষণাৎ কণ্টক বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধা সুস্থ হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে কতই অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল; শেষে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আপন কাষ্ঠের ঝুড়িটী সন্ন্যাসীদ্বয়কে উপহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সত্যব্রত ঈষৎ হাসিয়া তাহা হইতে, কি একটা গাছের কাঁচা ডাল—অবশ্য কোন অলৌকিক গুণবিশিষ্ট জানিতে পারিয়া, তুলিয়া লইলেন; এবং কিছুদূর গিয়াই একটা মৃত পাখীর পাখা কুড়াইয়া লইলেন। সত্যসখা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই, এই দুই মহাদ্রব্যে তোমার কোন্ কার্য্য সিদ্ধি হইবে?"

সত্যব্রত কোন উত্তর করিলেন না। উভয়েই বহুদূর অতি-

ক্রম করিলেন এমন কিছু দিন ভ্রমন করিয়া আর এক রাজ্যে উপনীত হইলেন।

রাজপথের একস্থানে বিস্তর জনতা দেখিয়া সন্ন্যাসীদ্বয় অনু-সন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, এই নগরের রাজকন্যা মহা আড়ম্বরে শিবপূজায় যাইবেন। তাহা দেখিবার জন্য সকলে সমবেত হইয়া উৎসুক চিত্তে দাঁড়াইয়া আছে। কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া আমাদের সন্ন্যাসীদ্বয় রাজকন্যা দর্শনার্থ সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে রাজনন্দিনী বহুমূল্য বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, বহু অশ্বগজপদাতী সমভিব্যাহারে দর্শন দিলেন। সত্যসখা, সেই অলৌকিক রূপলাবণ্যাবতী রাজকুমারীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল; মনের ভাব সহসা কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সত্যব্রত মনে মনে ইহা বুঝিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া, সত্যসখা সমভিব্যাহারে রাজঅতিথিশালায় উপস্থিত হইলেন; এবং যথাবিহিত আতিথ্যসংকারে উভয়ে কিছুদিন তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(৫)

লোক পরম্পরায় সত্যসখা ক্রমে অবগত হইলেন যে, রাজনন্দিনী এখনও কুমারী। তাঁহার তিনটি অতি গুরুতর প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্ন তিনটীর ঠিক উত্তর যিনি দিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ৯৯৯ জন ব্যক্তি তাহাতে

অকৃতকার্য্য হইয়াছে; অধিকন্তু রাজকুমারীর বিবাহপণের সর্ত্তানুযায়ী ফাঁসিরজ্জুতে প্রাণ দিয়াছে।

কত শত রাজা এবং রাজপুত্রও ইহাতে বিফল মনোরথ হইয়া, অকালে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া অবধি সত্যসখার অন্তরে রাজকন্যালাভের বাসনা আরও বলবতী হইল; মন কেবল সেই চিন্তাতেই মগ্ন রহিল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু সত্যব্রতকে এ সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিলেন। শেষে আরও কহিলেন যে, রাজকন্যা লাভ করিতে না পারিলে শেষে চাইকি তিনি আত্মহত্যা ও করিতে পারেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ সত্যব্রত সকলই বুঝিলেন; বালক সত্যসখার চিত্তোন্মত্ততা উপলব্ধি করিলেন। ভাবিলেন, এ দুর্দ্দমনীয় স্রোতে বাধা দেওয়া অতীব কঠিন; ইহার গতি অনিবার্য্য। বন্ধুকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশ দিলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই সত্যসখার মন টলাইতে পারিলেন না।

---

(৬)

সত্যসখা স্বয়ং রাজসমীপে যাইয়া আবেদন করিল। নৃপতি তাহার মনোহর আকৃতি দেখিয়া স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "তুমি বালক, কিন্তু তোমাকে এরূপ কঠোর সন্ন্যাস পথের পথিক দেখিতেছি কেন? আর সন্ন্যাসী হইয়াই বা পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতেছ কি জন্য? বুঝিলাম, আজিও তোমার চিত্ত-সংযম হয় নাই! দেখ, তুমি বালক, পৃথিবীতে এখনও

তোমার অনেক কাজ অবশিষ্ট আছে। আমার কন্যার বিবাহার্থী হইয়া কেন এমন অমূল্য জীবন অকালে নষ্ট করিবে? শুনিয়া থাকিবে, আমার শ্মশান-উদ্যানে কত শত লোক এই লোভে পড়িয়া ফাঁসিরজ্জুতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। কত রাজা, কত রাজকুমার, কত মহা মহা ব্যক্তির প্রাণ অকালে নষ্ট হইয়াছে অতএব তুমি ইহাতে নিরস্ত হও। আমার সে কন্যা ডাকিনী, হৃদয়বিহীনা, রাক্ষসী ও চণ্ডালিনী। কি জানি, সে কি পিশাচ-মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া ঈদৃশ পৈশাচিক কার্য্যে অনুরক্তা! এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই। অতএব বালক, তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করি, তুমি ইহাতে ক্ষান্ত হও।"

কিন্তু প্রণয়ের অনিবার্য্য গতি,—কাহার সাধ্য, বাধা দিয়া তাহার গতি রোধ করে? সত্যসখা পতঙ্গবৎ অগ্নিরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিতে সঙ্কল্প করিল। প্রণয়-তৃষ্ণা ও রূপতৃষ্ণা এমনই বস্তু বটে।

বলা বাহুল্য, অনতিবিলম্বে সত্যসখার এই প্রণয়োন্মত্ততা রাজকুমারীর ও কর্ণগোচর হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে প্রতিজ্ঞা-জয়ের অভিপ্রায়ে কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

(৭)

সত্যব্রত কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সত্যসখার অবশ্যম্ভাবী আশু বিপদের কথা স্মরণ করিয়া, তিনি প্রতিক্ষণ গভীর দুঃখে অভিভূত হইতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার

পর মনে মনে কি একটা সঙ্কল্প করিয়া সেইদিন অপরাহ্ণে সত্যসখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ ভাই, তুমি ইচ্ছা করিয়া জীবনকে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। বুঝিলাম, তোমার বড়ই গ্রহ-বিড়ম্বনা, দৈব তোমার প্রতিকূল! নহিলে, কে স্বেচ্ছায় পতঙ্গবৎ জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়? এত অনুরোধ করিলাম, এত উপদেশ দিলাম, কিছুতেই তুমি নিরস্ত হইলে না? ভাগ্য-ফল কে রোধ করিবে?"

সত্যসখা, সুধীর ও হিতৈষী বন্ধুর এ অমূল্য উপদেশ শ্রবণে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন দূরে থাক, উপেক্ষাভাবে ক্ষিপ্তের ন্যায় বিকট হাস্যে তাহা উড়াইয়া দিলেন।

বহুদর্শী, বিবেকী সন্ন্যাসী সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিলেন, বিষ ধরিয়াছে,—এ কাল ভুজঙ্গ-দংশনের আর ঔষধ নাই। পরে কথাপ্রসঙ্গে সত্যব্রত আপন ভিক্ষার ঝুলি হইতে কি একটা দ্রব্য বাহির করিয়া তাহাতে একরূপ সরবৎ প্রস্তুত করিলেন; এবং সত্যসখাকে কহিলেন, "বন্ধু এই সরবৎটুকু পান কর। ইহা সেবনে মস্তিষ্ক বেশ স্নিগ্ধ ও অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইবে। রাজকুমারীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার সময়—আর কিছুনা হোক—একটু ভাল করিয়া ভাবিতে-চিন্তিতেও পারিবে। ভাগ্যগুণে যদি প্রকৃত উত্তর দিতে পার, তার আর কথা কি!"

সত্যসখা ইহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই সরবৎটুকু পান করিলেন।

---

(৮)

সরবতে কিন্তু কোনরূপ মাদক দ্রব্য ছিল। পান করিয়া সত্যসখা শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এদিকে রজনী যখন দ্বিপ্রহর—সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ, সত্যব্রত তখন ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিলেন; আপনার ভিক্ষার ঝুলি হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই সরস বৃক্ষ-শাখা ও সেই মৃত পক্ষীর পাখানাটি বাহির করিলেন। এ দুই দ্রব্যের অদ্ভুত গুণ তিনি অবগত ছিলেন। অর্থাৎ এই দুই দ্রব্যের সম্মিলনে এবং ভৈরবী-সিদ্ধ মন্ত্রগুণে তিনি অবলীলা ক্রমে নিমেষমধ্যে বিহঙ্গজাতির ন্যায় শূন্যে উড্ডীন হইতে সমর্থ হইলেন। ইহার আর এক অপূর্ব্ব গুণ এই যে, যে ব্যক্তি ইহা ধারণ করিবে, সে সমস্তই দেখিতে ও অন্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবে; কিন্তু অন্য কেহই তাহার বিষয়ে কিছুই অবগত হইতে পারিবে না। কিছু দূর উড়িয়া, তিনি এক সুবৃহৎ প্রাসাদে উপনীত হইলেন। এই প্রাসাদ অধিকারিণী আমাদের রাজকুমারী।

রাজকুমারী তখন দুগ্ধফেননিভ সুগন্ধিময় বিলাসশয্যায় শুইয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে সে শয্যা ত্যাগ করিলেন। সহচরীদিগকে কহিলেন, "আজ আর আমোদ-প্রমোদ করিবার সময় নাই। জানই তো, কাল প্রাতেই সে শিশু সন্ন্যাসীর পরীক্ষার দিন! এক্ষণে আমি গুরুদেবের নিকট চলিলাম। আমাকে যথাবিহিত বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দাও।"

অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি সুসজ্জিতা হইলেন। পরিশেষে একাকী এক নিভৃত গৃহে যাইয়া সন্ন্যাসী সত্যব্রত ন্যায় যত্নে-রক্ষিত একটি কাঁচা বৃক্ষ শাখা ও একটি মৃত পক্ষীর ডানা সেইমত

অঙ্গে ধারণ করিলেন; এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অনন্ত শূন্যে উড্ডীন হইলেন। এই বৃক্ষশাখা ও পক্ষীর ডানার আর একটি গুণ এই যে, সমধর্ম্মী মধ্যে—অর্থাৎ যে যে ইহা ধারণ করিবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে,—কেহ কাহাকে দেখিতে পাইবে না। সুতরাং সন্ন্যাসী সত্যব্রত অলক্ষিত ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

---

(৯)

এইরূপে অনন্ত বিমানে উড়িতে উড়িতে, তাঁহারা কত দেশ, কত জনপদ, কত অরণ্য, কত প্রান্তর, কত সমুদ্র, কত পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। পরিশেষে রাজকুমারী তাঁহার গন্তব্য-স্থানে উপনীত হইয়া এক অতি গভীর সুড়ঙ্গময় পাতাল প্রদেশে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সত্যব্রতও মনোমধ্যে এতটুকু ভয় বা বিস্ময় না আনিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। শেষে রাজকুমারী তাঁহার অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন; এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সরস বৃক্ষশাখা ও মৃত পক্ষীর ডানা খুলিয়া ফেলিলেন।

এ স্থানটি একটি রাজ সভা। সত্যব্রত দেখিলেন, এই রাজ-সভার দৃশ্য অতি মনোহর। শত শত লোক স্ব স্ব মণিমুক্তা খচিত আসনে উপবিষ্ট; চতুর্দ্দিক উৎসব ও আনন্দময়। অপ্সরী-সদৃশ নর্ত্তকী বৃন্দ সুমধুর তানলয় সংযুক্ত গান গায়িতে গায়িতে তালে তালে নৃত্য করিতেছে; সুগন্ধি দ্রব্যের তীব্র আঘ্রাণে সমস্ত স্থান পরিপূর্ণ। সভার মধ্যস্থলে বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত সিংহা-সনে কিন্তু এক অতি কদাকার নরমূর্ত্তি বা প্রেত-যোনি বিভী-

ষিকা দেখাইতেছে। এই সময় সত্যব্রতের অন্তরে ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই এবং তাঁহার আগমন বার্ত্তাও জানিতে পারে নাই।

নৃত্য গীত সমাপনান্তে সকলেই রাজকুমারীকে যথাবিহিত আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া রাজসিংহাসন সন্নিকটে উপনীত হইলেন। সেই নর-পিশাচ প্রেতমূর্ত্তিরাজাও তাঁহার স্বাগত কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসাদির পর স্বাভাবিক বিকৃত স্বরে কহিল, "কল্যাণি, আজ কি মনে করিয়া? এত দিনে কি আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল?"

রাজকুমারী উত্তর করিল, "গুরুদেব, আপনি অন্তর্য্যামি,—আপনার অবিদিত কি আছে? মা রণচণ্ডীর কৃপায় বুঝি এত দিনে আমরা পূর্ণমনোরথ হইলাম! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন। প্রভু, এই শেষবার; এইবার প্রতিজ্ঞা জয় করিতে পারিলেই আমাদের আজীবনসঞ্চিত আশা পূর্ণ হয়। দেব, আপনার কৃপায় ৯৯৯ জনকে অকালে যমালয়ে পাঠাইয়াছি, বাকী আর একটি মাত্র! ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক এবং আপনারও অদ্ভুত কীর্ত্তি লাভ হয়। অতএব দেব, ত্বরায় উপায় উদ্ভাবন করুন; ইহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই আপনি সসাগরাধিপতি হন, আর আমিও অমরা হইয়া অতুল্য প্রতাপে এই ধরাধামে বিচরণ করিতে পারি।

এই বলিয়া তিনি সত্যসখার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বৎসে ইহার জন্য আর চিন্তা

কি? অগ্রে শ্রম দূর কর; মন প্রফুল্ল হোক। আমি এখনই প্রশ্ন বলিয়া দিতেছি। মনুষ্যের সাধ্য কি যে, আমার মনোভাব অবগত হইবে!”

কিছুক্ষণ আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া গেল। তদনন্তর সেই অদ্ভুত নৃপতি রাজকুমারীকে কহিলেন, “কন্যা তোমার বিবাহ সভায় সকলের সমবেত হইলে, তুমি সেই প্রণয়োন্মত্ত বাল-সন্ন্যাসীকে কহিবে যে, ‘আমার মনের ভাব কি বল?’ উত্তর ‘ঘেঁটু ফুল’। পৃথিবীর এত জিনিস থাকিতে ‘ঘেঁটু ফুলের’ নাম সে কখনই করিতে পারিবে না। আর, যদিই বা প্রথমটায় জয়ী হইতে পারে, তিন দিনে তিন প্রশ্ন করিবে ত!—দ্বিতীয় দিনে আমি এমন প্রশ্ন বলিয়া দিব, যাহা কিছুতেই তার মনে আসিবে না। বৎসে, যাও—নিশ্চয়ই তুমি অমরী হইতে পারিবে।

“সে আপনারই কৃপা!” বলিয়া রাজকুমারী গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সকরুণ-কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বিদায় লইলেন: গুরুদেবও যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রশ্নের ফল কি হয় জানিতে চাহিয়া বিদায় দিলেন। রাজকুমারী পূর্ব্বমত পন্থাবলম্বনে ক্রমে ক্রমে আবার সেই ভয়াবহ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সত্যব্রতও স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

---

(১০)

বহুপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে উঁহারা উভয়েই আপনাপন গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলেন। তখন নিশা প্রায় শেষ হইয়াছে।

সত্যব্রত অতি অল্পক্ষণমাত্র শয্যায় বিশ্রাম করিয়া বন্ধু সত্যসখার নিদ্রাবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইয়া গেল, তথাপিও তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে না দেখিয়া সত্যব্রত চেষ্টা করিয়া বন্ধুকে জাগরিত করিলেন। এবং একটু উদ্‌গ্রীব ভাবে কহিলেন, "ছি ভাই! তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান নাই! আজ না রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বিবাহ সভায় যাইবে?"

"হ্যাঁ—তাই তো!" এই বলিয়া সত্যসখা অতি ব্যস্তভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন। তাঁহার বিবাহ সভায় যাইবার সময় সত্যব্রত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ভাই, বিবাহ সভায় তো যাইতেছ; কিন্তু রাজকুমারীর প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, বল দেখি?"

উত্তর আর কি দিব? সেখানে, উপস্থিত যাহা মনে আসিবে, তাহাই বলিব!"

সত্যব্রত একটু হাসিলেন; বলিলেন, "ভাই, মজিতে ত বসিয়াছ, আর উপায় নাই। স্বেচ্ছায় কাল সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিলে কে জীবন রক্ষা করিতে পারে? এক্ষণে আমার এই একটি শেষ অনুরোধ রক্ষা কর। দেখ ভাগ্যগুণে যদি সফলমনোরথ হও!"

সত্যসখা আগ্রহ সহকারে বন্ধুর উপদেশ শুনিতে চাহিলেন! সত্যব্রত কহিলেন, "দেখ, কাল রাত্রে যখন আমি তোমার আশু-বিপদের কথা ভাবিয়া মনে মনে নানা অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলাম এবং এক একবার ইষ্ট দেবতা মা চণ্ডিকার উদ্দেশে তোমার মঙ্গলার্থ হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছিলাম, সেই সময়

মা যেন সদয় হইয়া আমায় প্রত্যাদেশ করিলেন যে, 'তোর ভয় নাই! আমি তোর বন্ধুকে এ বিপদে উদ্ধার করিব! তার বিবাহ সভায় যাত্রা কালে তাকে কেবলমাত্র আমার আজ্ঞা জানাইয়া বলিস যে, যে সময় রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিবে,— 'আমার মনের ভাব কি বল—আমি কি মনে করিয়াছি?' তখন যেন তোর বন্ধু বলে যে, 'ঘেঁটু ফুল'। তাহা হইলেই তোর বন্ধুর প্রথম দিনের পরীক্ষায় জয় হইবে।' পরে আমি দেখি, কেউ কোথাও নেই। তাই বল্‌ছি ভাই, তুমি এম্‌নে ত মারা গিয়েইছ, তা দেখ, মার প্রত্যাদেশে যদি রক্ষা পাও।"

সত্যসখা হৃষ্টচিত্তে বন্ধুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

(১১)

এক সুবিস্তৃত ময়দানে বিরাট-বিবাহ সভা সজ্জিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক উদ্‌গ্রীব ভাবে বিবাহ সভায় বিরাজ করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে সিংহাসনোপরি রাজা উপবিষ্ট; দক্ষিণে বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিতা রাজকুমারী দণ্ডায়মানা। ক্ষণপরেই সত্যসখা ও সত্যব্রত বিবাহ সভায় দেখা দিলেন। দর্শকগণের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বিরাট সভা নিস্তব্ধ—গম্ভীরভাব ধারণ করিল। রাজা এখনও সত্যসখাকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সত্যসখা অচল—অটল ভাবে পরীক্ষা প্রশ্নের উত্তর দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন! রাজকুমারী প্রশ্ন করিলেন,—"আমি কি মনে করিয়াছি বল?" সত্যসখা উত্তর করিলেন,—ঘেঁটু ফুল।" রাজকুমারীর মুখ ম্লান হইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, উত্তর ঠিক হইয়াছে ত ?" নত-মুখে রাজকুমারী উত্তর করিলেন,—"হাঁ।"

মুহূর্ত্তকালের জন্য সভামধ্যে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। সকলেই সত্যসখাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তিই আসিয়াছে, প্রথম উত্তরেই শমন-সদনে গিয়াছে,— দ্বিতীয় উত্তর দিতে কাহারও অবসর হয় নাই। কিন্তু এবার এই প্রথম পরীক্ষায় এই শিশু-সন্ন্যাসীর জয় হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইল। রাজাও হৃষ্টচিত্তে মনে মনে কহিলেন, "আঃ! এই দেব-শিশু হইতেই বুঝি আমার রাজ-কুল-মান সমস্ত রক্ষা হইবে!—এত দিনে বুঝি বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন!"

এইবার রাজকুমারীর দ্বিতীয় প্রশ্ন। পাঠকের স্মরণ আছে, রাজকুমারী যে উপায়ে, যে স্থান হইতে প্রথম প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন; দ্বিতীয়বারও তিনি ঠিক সেই উপায়ে সেখান হইতে দ্বিতীয় প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া আনিলেন।—সে প্রশ্নের উত্তর, তাঁর সেই গুরুর পায়ের "কনিষ্ঠ অঙ্গুলি।" বলা বাহুল্য, সত্যব্রতের পূর্ব্বোক্ত কৌশলে. সত্যসখা এবারও—এই দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন।

(১২)

কিন্তু এইবার শেষ পরীক্ষা! বারবার এইবার তিন বার। এইবার হয় সত্যসখা রাজকুমারীলাভে কৃতকার্য্য হইবেন, নয় তাঁহাকে অকালে কালের কোলে শয়ন করিতে হইবে! যাই হোক, রাজকুমারীর গুরু কিন্তু এবার রাজকুমারীকে কহিলেন "বৎসে, কল্য বিবাহসভায় প্রশ্ন রহিল,—'আমার মস্তক'।

তুমি এই প্রশ্নেই সেই দুরাকাঙ্ক্ষ-পরায়ণ বালককে ফাঁসি-রজ্জুতে ঝুলাইতে পারিবে। আর, আজ আমি নিজেও তোমার সঙ্গে যাইতেছি। আমি উপস্থিত না থাকাতেই দুই দিনই তোমার পরাজয় হইয়াছে। এবার দেখিব, কার সাধ্য, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়!"

এই বলিয়া রাজকুমারী-সমভিব্যাহারে গুরুও সেই স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইতে মনস্থ করিলেন।

কিন্তু পাঠক, এ দিকে আমাদের সেই সত্যব্রত সন্ন্যাসী কি করিতেছেন, দেখুন! তিনি যেই শুনিলেন যে, কন্যাকার প্রশ্নের উত্তর—'রাজকুমারীর গুরুদেবের মস্তক',—অমনি তথা হইতে অলক্ষিত ভাবে একখানি তীক্ষ্ণধার অসি সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পন্থাবলম্বনে অগ্রে রাজকুমারী, পরে এই পিশাচ-গুরু এবং পরিশেষে তাঁহাদের অলক্ষিত ভাবে সত্যব্রত সন্ন্যাসী অনন্ত বিমানপথে উড্ডীন হইলেন।

রাজকুমারীও তাঁহার গুরু প্রায় তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় সন্ন্যাসী সত্যব্রত চকিতের ন্যায় গুরুর কেশাকর্ষণ করিয়া সেই তীক্ষ্ণধার তরবারির সাহায্যে তাহার মুণ্ডটি কাটিয়া লইলেন। গুরুর প্রাণহীন জড়দেহ ভূমে নিপতিত হইল। বলা বাহুল্য, অগ্রগামিনী রাজকুমারী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। সেই সরস বৃক্ষ-শাখা ও সেই মৃত পক্ষীর পাখানা—এ দুয়ের গুণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ধারণে, সমধর্ম্মীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তীকে দেখিতে পায় না। সুতরাং সত্যব্রত কর্তৃক গুরুর

মুণ্ডচ্ছেদ, রাজকুমারী কিছুই জানিতে পারিলেন না। রাজকুমারী নিজ নিবাসে উপনীত হইলেন, সত্যব্রতও সানন্দে বাসায় ফিরিলেন। অতঃপর সত্যব্রত অতি ব্যস্ততা সহকারে সেই ছিন্ন মুণ্ডটি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া একটি কাপড়ের মোটরূপে পরিণত করিলেন।

প্রভাত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও তিনি বন্ধু সত্যসখার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। সেই মত কালিকাদেবীর দোহাই দিয়া কহিলেন, "দেখ, মায়ের কৃপায় দুই দিন তুমি জয়ী হইয়াছ। আজ তৃতীয় দিনের তৃতীয় পরীক্ষা! তা দেখ, কল্য রাত্রে আমি গভীর ধ্যানে মা-চণ্ডিকার আরাধনা করিতেছিলাম; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "ভয় নাই; তোর বন্ধুরই জয় হইবে! এই বস্ত্রাবৃত যে জিনিসটি দিতেছি, এইটি তাহাকে প্রদান করিস্। তাহাকে বলিস্ যে, বিবাহসভায় যখন তাহাকে রাজকুমারী প্রশ্ন করিবে, 'আমার মনের ভাব কি বল!' তখন সে, যেন মুখে কোন উত্তর না দিয়া বলে, 'এই কাপড়ের বস্তার মধ্যে যাহা আছে, তুমি তাহাই মনে করিতেছ।' তাহা হইলে আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু সাবধান, যেন ভ্রমেও প্রশ্নের উত্তর দিবার অগ্রে কাপড়ের এ মোটটি না খুলে। তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইবে,—তাহার প্রাণ যাইবে।' তাই ভাই, তোমায় অনুরোধ করিতেছি, যেন তুমি ভ্রমক্রমেও, প্রশ্নের উত্তর দিবার অগ্রে, এই কাপড়ের মোটটি না খোল!"

সত্যসখা তাহাই স্বীকার করিলেন।

(১৩)

আজ তৃতীয় দিন। সমাগত দর্শকমণ্ডলী আজ সকলেই বিবাহ-সভায় অধিকতর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। আজ বাল-সন্ন্যাসীর জীবন সংশয়! এজন্য সকলেই অতিশয় দুঃখিত ও বিমর্ষ, অথচ কিছু কৌতূহল ভাবাপন্ন।

যথাসময়ে সত্যসখা ও সত্যব্রত তথায় দর্শন দিলেন। সন্ন্যাসিদ্বয় সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র সেই বহু জনাকীর্ণ বিরাট বিবাহসভা এককালে নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। রাজা সত্যসখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বালক সন্ন্যাসী! আজ তোমার শেষ উত্তর;—অতএব প্রস্তুত হও।"

তৎপরে কন্যাকে প্রশ্ন করিতে বলিলেন। রাজকুমারী সত্যসখাকে কহিলেন, "আমার মনের ভাব কি বল! উপস্থিত আমি কি মনে করিতেছি?"

সত্যসখা কিছু না বলিয়া বন্ধুর উপদেশমত সেই বস্ত্রের মোটটি রাজপদতলে ফেলিয়া দিয়া রাজকুমারীকে কহিলেন, "এই কাপড়ের বস্তার মধ্যে যাহা আছে, আপনি তাহাই ভাবিতেছিলেন।"

সমাগত সমস্ত লোক অধিকতর উৎসুকভাবে তাহা দেখিতে অগ্রসর হইল। রাজার আদেশে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বস্ত্রাবৃত দ্রব্যটি উন্মুক্ত হইল। একজন রাজকর্ম্মচারী সেইটি হাতে করিয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিল। সভাস্থ সকলে ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিতভাবে "একি, একি" রব করিয়া উঠিল! গুরুর ছিন্ন মুণ্ড দেখিবামাত্র রাজকুমারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল; সর্ব্বশরীর সহসা ঘোর কালিমাময় হইল।

এখানে বলা আবশ্যক যে, রাজকুমারীর মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে ইচ্ছা মনোমধ্যে লয় করিতে হইবে। যেহেতু, মিথ্যা বলিলেও, অবশ্যম্ভাবী প্রত্যক্ষ প্রমাণে সত্য আপনা হইতে প্রকাশ পায়; তাঁহার মুখ কালিমাময় হইয়া যায়। সুতরাং কিছুতেই রাজকুমারী সত্য অস্বীকার করিতে পারিতেন না। এ ব্রতের নিয়মই এই। সেই জন্য প্রশ্ন পরীক্ষায় কেহ যথার্থ উত্তর প্রদান করিলে, রাজকুমারীকে সত্য স্বীকার করিতেই হইত। যাইহোক, এখন কাহারও জানিতে বাকী রহিল না যে, সত্যসখারই জয় হইল। সুতরাং চারিদিকেই জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। আনন্দের রোল গগন-মার্গ ভেদ করিল। রাজা সত্যসখাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আনন্দবিভোর প্রাণে তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! তোমা হইতেই এতদিনে আমার কুল মান মর্য্যাদা সকলই রক্ষা হইল,—কত শত লোকের অকাল মৃত্যুর পথ রোধ হইল! আমি তোমাকে আমার প্রতিশ্রুত অর্দ্ধরাজ্য ও এই কন্যা দান করিলাম।"

---

(১৪)

রাজকুমারী এইবার সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিলেন। এবং গুরুদত্ত মন্ত্রগুণে স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইলেন। রাজাকে বলিলেন, "পিতঃ! আমার এই গুরু একজন পিশাচসিদ্ধ। আজ কয়েক বৎসর হইল, একদিন অন্তঃপুরোদ্যানে আমি ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় আমি ইহাঁর দর্শন পাইলাম। উদ্যানে একটি মৃত পক্ষী পড়িয়া ছিল। ইনি হঠাৎ পক্ষীটিকে জীবিত করিতে পারিলেন দেখিয়া আমি ইহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম

ইহাঁরই আদেশানুসারে এতদিন আমি সমস্ত রহস্য অপ্রকাশ রাখিয়াছিলাম।"

তদনন্তর পিতার নিকট মুক্তকণ্ঠে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, "পিতঃ, রাজা ও রাজপুত্রাদি যে ৯৯৯ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার শ্মশান-উদ্যানে ফাঁসিরজ্জুতে অবলম্বিত আছেন, আমি সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে এখনই তাঁহাদের পুনর্জীবন দান করিতেছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

এই বলিয়া অস্ফুটস্বরে মন্ত্র জপ করিবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ৯৯৯ জন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং রাজা ও রাজকুমার হৃষ্ট চিত্তে তথায় উপনীত হইয়া সত্যসখাকে অভিবাদন করিয়া বারং বার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সত্যব্রতও এইবার সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিলেন। যে উপায়ে তিনি বন্ধু সত্যসখাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমর্থ হন, অবিকল আদ্যোপান্ত বলিলেন।

এই অলৌকিক ব্যাপার শ্রবণে সকলের চক্ষেই আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। সকলেই যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আনন্দ কোলাহল একটু উপশমিত হইলে এইবার সত্যসখা সর্ব্বসমক্ষে প্রাণের বন্ধু সত্যব্রতকে নির্দ্দেশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে সেই লোক মণ্ডলীকে কহিলেন, বোধ করি, সকলেই বুঝিয়াছেন "আমি নিমিত্ত মাত্র। এই মহাত্মা সদাশয় বন্ধুর অনুগ্রহেই আমি এ ভীষণ পরীক্ষা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। সুতরাং ইহাঁর ঋণ অপরিশোধনীয়!"

সত্যব্রত নীরবে নতশিরে দণ্ডায়মান রহিলেন। এইবার সত্যসখা বন্ধু সত্যব্রতকে কহিলেন, "ভাই, আমি এই মহা-

সভায় সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমার অকৃত্রিম উপকারের যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার স্বরূপ আমি আমার প্রাপ্য অর্দ্ধ রাজ্য হইতে কৃতজ্ঞোপহার স্বরূপ তোমাকে তাহার অর্দ্ধেক দান করিতেছি। অতএব ভাই, সানন্দে বন্ধুর এই প্রীতির উপহার গ্রহণ কর।"

(১৫)

সত্যব্রত কহিলেন, "তবে আমিও বলিতেছি, সভাস্থ সকলে শ্রবণ করুন। সকলে বিচার করুন, কে উপকারক, আর কে উপকৃত!"

এই বলিতে বলিতে সত্যব্রত স্বশরীরে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন।

উঠিতে উঠিতে আবার সত্যসখাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"প্রাণের বন্ধু! ভাই সত্যসখা! আমায় কি তুমি চিনিতে পারিতেছ না? তোমার সেই গৃহত্যাগের দিন স্মরণ কর দেখি! মনে আছে কি, সেই দিন গভীর নিশীতে সেই ভয়াবহ শ্মশান ক্ষেত্রে একটি শব দাহ করিতে কতকগুলি লোক উপস্থিত হইয়াছিল? মনে হয় কি, সেই মৃত লোকটির দুইশত টাকা ঋণ ছিল? আরও মনে আছে কি, সেই দুই শত টাকার জন্য তাহার প্রতি সেই শবদাহকারীদের কি ভীষণ নিগ্রহ! শেষে সে নিগ্রহ দেখিয়া,—দয়াবান বন্ধু তুমি,—তোমার একমাত্র সম্বল, —বুকের রক্তেরও অধিক,—সেই দুই শত টাকা তাহাদিগকে দান করিয়া তুমি সেই মৃত ব্যক্তির সদ্গতি কর! সে সব কথা মনে

পড়ে কি? টাকা পাইয়া তবে তাহারা সেই শবের যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে, স্মরণ হয় কি? প্রাণের বন্ধু, দীনের রক্ষক, ভাই সত্যসখা! এ অভাগাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমিই সেই শব-দেহ!—আমিই সেই দুর্ভাগ্য জীব! তোমার কৃপায় আমার আত্মার সদ্গতি হইয়াছে,—আমি মুক্তি পাইয়াছি। ভাই, তোমারই অশেষ কল্যাণে আমি ঋণের হাত এড়াইয়া দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাই, পৃথিবীতে এই শিক্ষা দাও,—যেন জীবনে, পারত পক্ষে কেহ ঋণ না করে! আর যদিই একান্ত ঋণ করিতে হয়, তাহা না শোধিয়া যেন তাহার দেহান্তর না হয়! তোমাদ্বারা আমি যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার ত কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই। তাই ভাই, শরীরীবেশে এতদিন ছায়ার মত তোমার পাছে পাছে ছিলাম। এত দিন তোমারই সঙ্গ লইয়া ছিলাম,—কিসে তোমার সে মহা উপকারের কিছু মাত্রও প্রত্যুপকার করিতে পারি! তাই আমার সন্ন্যাসী বেশ ধারণ, তাই আমার পৃথিবীতে অবতরণ! কিন্তু ভাই, ভগবানের কৃপায় এতদিনে আমার কার্য্য শেষ হইল! এখন আমি স্বর্লোকে প্রস্থান করিলাম!"

এই বলিতে বলিতে সত্যব্রতের সেই মূর্ত্তি অলৌকিক জ্যোতির্ম্ময় রূপে অনন্ত নীলিমাময় ব্যোমপথে মিশিয়া গেল। সত্যসখার মুখ হইতে জলদগম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল,—"অদ্ভুত প্রত্যুপকার!" সেই সমাগত সহস্র সহস্র দর্শক মণ্ডলীর মুখ হইতে এককালে ধ্বনিত হইল,—"অদ্ভুত প্রত্যুপকার!" সেই স্বর ঘনীভূত হইয়া দিক্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল,—"অদ্ভুত প্রত্যুপকার"! যেন সেই স্বর সেই অনন্ত নীলিমাময় ব্যোমপথ বিদীর্ণ

করিয়া সত্যব্রতের অনুসরণ করিল;—স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার করিয়া তাঁহার সাধুবাদের বিজয়-ভেরীর সহিত মিলিয়া বাজিয়া উঠিল,—"অদ্ভুত প্রত্যুপকার!"

রাজা, রাজকুমারী ও সমাগত লোকমণ্ডলী সকলেরই প্রাণে অপূর্ব্বভাবের আবির্ভাব হইল। সকলেই বিস্মিতভাবে একবার সেই অনন্ত আকাশপানে ও একবার সত্যসখার মুখপানে দেখিতে লাগিল।—সকলেরই কাণে ও প্রাণে যেন গম্ভীরনাদে বাজিতে লাগিল,—"অদ্ভুত প্রত্যুপকার!"

তারপর?—তারপর যথাসময়ে, মহাসমারোহে রাজকুমারীর সহিত সত্যসখার শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সমাধা হইল। কিন্তু সে সকল বিষয়ের আলোচনা করা এ আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য নহে।

সমাপ্ত।





অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট-ছাড়া পথ নাই। অন্যে পরে কা কথা,—স্বয়ং বিধাতা-পুরুষও অদৃষ্ট-লিপি খণ্ডন করিতে পারেন না। এই জন্য হিন্দুর জ্যোতিষ-শাস্ত্র জগদ্বিখ্যাত। এই আখ্যায়িকাটিতে হিন্দুর অদৃষ্টবাদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয় কিছু কিছু বুঝা যাইবে।

---

(১)

কোন গ্রামে এক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ একদিন নিজের 'কোষ্ঠী' গণনা করিয়া দেখিলেন যে, কুম্ভীরগ্রাসে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে। অপঘাতে, জীবননাশ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া, ব্রাহ্মণ ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু মায়া-মোহের কি বিচিত্র লীলা,—ঘোর অদৃষ্টবাদী জ্যোতিষী ব্রাহ্মণেরও বিধিলিপিতে সংশয় জন্মিল। কর্ম্ম কাল ও পুরুষকারের আশ্রয় লইয়া, ব্রাহ্মণ অদৃষ্ট জয় করিতে কৃতনিশ্চিত হইলেন। যে দেশে গঙ্গা নাই, নদ, নদী বা বিস্তৃত জলাশয় নাই, সেই দেশে বাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

যথাসময়ে, ব্রাহ্মণ পাঁজী পুঁথি লইয়া, এক গঙ্গাহীন—জলাশয়হীন দেশে উপনীত হইলেন।—সে দেশে নদ, নদী, সরোবর

কিছুই নাই,—স্থানে স্থানে দুই একটি মাত্র কূপ আছে। ব্রাহ্মণ, সেই স্থানে অবস্থান করিতে মনোনীত করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে ব্রাহ্মণের বিদ্যা, বুদ্ধি ও গুণগরিমা সাধারণে প্রকাশ পাইল। সেই দেশের রাজা, ব্রাহ্মণকে সাদরে আহ্বান করিয়া, আপন সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। অধিকন্তু, রাজকুমারের শিক্ষাভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের শিক্ষাগুণে, রাজকুমার অতি অল্পকালের মধ্যে, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইলেন। বার, ব্রত, উপবাস ও হিন্দুর আচারের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই রাজকুমার পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন।

রাজা, পুত্রের ঈদৃশ ধর্ম্মভাব দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে অধিকতর ভক্তি করিতে লাগিলেন। এমন কি, পুত্রকে ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গচ্যুত করিতেন না। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল।

---

(২)

একদিন এক মহাযোগ উপলক্ষে রাজপুত্র গঙ্গাস্নান করিতে অভিলাষী হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে, রাজা অতিশয় সুখী হইলেন, এবং অবিলম্বে পুত্রের বাসনানুযায়ী আয়োজন করিতে মন্ত্রীকে অনুমতি দিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে যানাদি প্রস্তুত হইল। রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারী হইতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ, তাহাতে আপত্তি করিলেন। রাজপুত্র বিনয় সহকারে, পুনঃ পুনঃ অনু-

বোধ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "দেব, আপনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন; আপনার অমূল্য উপদেশে আমি মানুষ হইয়াছি; আপনার ঋণ ইহজীবনে শোধিতে পারিব না! আপনি ত মুহূর্ত্তের জন্য আমার কাছ-ছাড়া হন না; কিন্তু আজ কেন এ অধীনের প্রতি বাম হইতেছেন? গঙ্গা-মাহাত্ম্য আপনিই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাই আমি গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য-সঞ্চয় করিতে বাসনা করিয়াছি। আগামী পরশ্ব যোগ;—দেব, এ সময়ে, আপনি কেন আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতেছেন?"

ব্রাহ্মণ, মনোভাব গোপন করিলেন। এখানে আসিয়া অবধি, তিনি কাহারও নিকট মনের কথা প্রকাশ করেন নাই। অধিকন্তু, স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তিনি আপন অদৃষ্ট-গণনার কথাও একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রাজপুত্রের গঙ্গা স্নান যাইবার কথা শুনিয়া আজ তাঁহার সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। যে ভয়ে, স্বদেশ ও স্ব-গোত্র এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া তিনি এই গঙ্গাহীন দেশে বাস করিতেছেন, রাজপুত্রের মুখে আজ বহুদিনের পর সেই কথা শুনিয়া, তিনি চমকিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ সে ভাব গোপন করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সুচতুর রাজপুত্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। করযোড়ে, অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "দেব, চিরদিন আমাকে সন্তানতুল্য ভাবিয়া আসিতেছেন, আজ কেন সেবককে অবিশ্বাস করিতে-ছেন? আপনার মনের কথা কি, অপকটে প্রকাশ করুন; আমি সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা পাইব।"

(৩)

ব্রাহ্মণ, এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "রাজ-কুমার, তুমি মনক্ষুণ্ণ হইও না। আমার দুরদৃষ্টের কথা শুনিলে, ভরসা করি, তুমিও গঙ্গাস্নানে যাইতে আমাকে নিষেধ করিবে। এবং সেই জন্যই, আমি এই দীর্ঘকাল ঘর-বাড়ী-ত্যাগ করিয়া প্রবাসে—এই গঙ্গাহীন দেশে অবস্থান করিতেছি। আমার সে দুঃখের কথা এতদিন কাহাকেও বলি নাই; এবং এখানে আসিয়া, সে কথা একরূপ ভুলিয়াগিয়াছিলাম বলিলেও হয়। কিন্তু আজ তোমার গঙ্গা স্নানে যাইবার কথায়, আমার সেই দারুণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে 'কোষ্ঠীর' ফলাফল জ্ঞাপন করিলেন। কহিলেন, "কুমার! জানিয়া শুনিয়া কেন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে যাইব?"

কথা শুনিয়া রাজপুত্র একটু হাসিলেন। কহিলেন, "দেব, আপনি এ কিরূপ কথা কহিতেছেন? আপনি ত এ অধীনকে কতবার উপদেশ দিয়াছেন যে, কর্ম্ম বা পুরুষকার দ্বারা এবং কালসহযোগে অদৃষ্ট জয় করা যায়। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত; অতএব শাস্ত্রসঙ্গত কর্ম্ম ও পুরষকার দ্বারা অদৃষ্ট জয় করুন। কর্ম্ম ও পুরুষকারের আশ্রয় লইলে কালও আপনার সহায় হইবে। অতএব আসুন, পরীক্ষা করিয়া দেখি, কিরূপে দুরন্ত কুম্ভীরে আপনার প্রাণ-সংহার করে!"

---

(৪)

ইহাতেও ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে কহিলেন, "গুরুদেব! ভয় কি? আমি পিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—এখনই শত শত রক্ষক আমাদের সমভিব্যাহারী হইবে।"

ব্রাহ্মণ, ইহাতেও অসম্মত হইলেন। এবার রাজপুত্র কিছু মনক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ভাল, আপনি গঙ্গাস্নান না করেন, নাই করিবেন; কিন্তু গঙ্গা দর্শনে ত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ভরসা করি, আপনার চরণে আমার এ শেষ প্রার্থনাটিও নিষ্ফল হইবে না।"

এত অনুনয়-বিনয় ও প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ অগত্যা রাজপুত্রের সমভিব্যাহারে যাইতে স্বীকার করিলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের গঙ্গাস্নান যাত্রার সমস্ত আয়োজন হইল। অতঃপর, শুভক্ষণে শুভলগ্নে, বহু লোকজন সমভিব্যাহারে, মহাসমারোহে, রাজপুত্র গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলেন।

---

(৫)

যথাসময়ে, তাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেন। কল-কলনাদিনী, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মনোহরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজপুত্র পরম প্রীতিলাভ করিলেন। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। দেশ দেশান্তর হইতে কত ভক্তিমতী রমণী ও ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ জীবনের কল্যাণ-কামনায় এই পবিত্র পুণ্যময় তীর্থে সমবেত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অনেক দিনের পর গঙ্গাদর্শন করিলেন;

কিন্তু প্রীতির পরিবর্ত্তে তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া অঙ্কিত হইল।

রাজপুত্র কহিলেন, 'গুরুদেব, যখন এত দূর আসিয়াছেন, তখন কি একবার মা-গঙ্গার অবগাহন করিয়া যাইবেন না ?"

ব্রাহ্মণ, অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাজপুত্র পুনরায় কহিলেন, "দেব, অবগাহন করিয়া স্নান না করেন ক্ষতি নাই, কিন্তু গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে, বোধ করি, আপনার আপত্তি নাই। আমার এই শত শত রক্ষক লাঠি ও তরবারী হস্তে আপনাকে রক্ষা করিবে। আরও এক কথা,—আপনি একটিমাত্র সোপান জলে নামিয়া, গঙ্গাজল স্পর্শ করিবেন। শত শত রক্ষক থাকিতে আর অতটুকু জলে কুম্ভীর আসিতে সাহস করিবে না !"

ব্রাহ্মণ, কিছুক্ষণ, কি ভাবিলেন। পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ভাল, তাহাই করিতেছি !"

---

(৬)

রাজপুত্র, মহানন্দে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় নামিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র শত শত রক্ষক সুসজ্জিতাবস্থায় ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিল। এক এক করিয়া স্থলপথের সমস্ত সোপান অতিক্রম করিয়া, ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজপুত্র ঠিক তাঁহারই পশ্চাতে ছিলেন। গুরুকে চমকিত ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিলেন, "দেব, আবার এ কি হইল ? আপনি এই সোপানটি অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গাজল স্পর্শ

করিয়া তীরে উঠুন ; আমি স্নান সমাপনান্তে আপনার সহিত মিলিত হইব।”

ব্রাহ্মণ, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় যেমন এক পদে জল স্পর্শ করিবেন,— হরি হরি হরি ! ! ! রাজপুত্র অমনই প্রবলবেগে জলে ঝাঁপ দিয়া,—“আমিই সেই কুম্ভীর !” বলিয়া ভীমমূর্ত্তিতে, ব্রাহ্মণকে ছিনাইয়া লইয়া, অতলজলে অন্তর্হিত হইলেন !

রক্ষকগণ অমনি ‘হাঁ হাঁ’ করিয়া লাঠি ও তরবারী সাহায্যে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা পাইল ; কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল !

তীর হইতে সকলে ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিতভাবে দেখিতে পাইল,—রাজপুত্র ভীষণ কুম্ভীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অগাধ জলে, ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইতেছে।





সংসার ও সন্ন্যাস।

"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?" সংসারী হইব, না সন্ন্যাসী সাজিব? আমরা না সংসারী না সন্ন্যাসী! প্রকৃত সংসার বা প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্ম বড়ই কঠিন। আমরা এখন এ দুইটার কোনটা অবলম্বন না করিয়া একরূপ সং সাজিতেছি মাত্র। প্রকৃত সংসার বা সন্ন্যাস উভয়ই অতি কঠিন ধর্ম্ম ও কঠিন আশ্রম। প্রকৃত সংসারী বা সন্ন্যাসীর দায়িত্ব আরও কঠিন। ইহসংসারে এ দুয়েরই অভাব বিশেষরূপ পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত প্রকৃত সংসারী বা সন্ন্যাসী হইতে হইলে, কত ত্যাগস্বীকার, কত সহিষ্ণুতা, কত অসাধ্যবসায়, কত তিতিক্ষা, কত সৎগুণের প্রয়োজন, নিম্নলিখিত এই গল্পটিতে সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব।

---

(১)

কোন মনীষাসম্পন্ন ঋষিতুল্য মহাত্মার দুইটি শিষ্য ছিল। শিষ্যদ্বয় বাল্যকাল হইতেই গুরুগৃহে থাকিয়া তদীয় ব্রহ্মচর্য্যরূপ কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা আপন আপন প্রতিভা বলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র শাস্ত্র-অধ্যয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু, কেবল মাত্র শাস্ত্রালোচনা করিলে, ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ বা সেই কঠোর ব্রতের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধন হয় না। যে যে মহৎ দ্রব্য-গুণের সংস্পর্শে

ব্রহ্মচর্য্যরূপ জলন্ত আগুনের সৃষ্টি হয়, তাঁহাদের মধ্যে সেই সকল দ্রব্যের কোন কোন অংশের অভাব বা অসম্পূর্ণত্ব ছিল। শিষ্যদ্বয় সে অসম্পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই;—তাঁহাদের গুরুদেব তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর, সেই কারণেই তিনি, শিষ্যদ্বয়ের বিদায়কালে একটু ইতস্ততঃ করিয়া কৌশল-পূর্ব্বক কহিলেন যে, অমুক রাজ্যের অমুক রাজকন্যার নিকট গমন করিলে, তিনি তাঁহাদের উপযুক্ত আশ্রম অবলম্বনের কথা বলিয়া দিবেন। অর্থাৎ শিষ্যদ্বয় সংসার কি সন্ন্যাস-আশ্রমীর যোগ্য, তাহা নির্দ্দেশ করিবেন।

শিষ্যদ্বয়ও উক্ত কথামত, গুরুর নিকট বিদায় লইয়া, রাজ-কুমারীর উদ্দেশে পূর্ব্ব কথিত রাজ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। তাঁহারা আশ্রয় অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু অরণ্যের মধ্যে আশ্রয় মিলিবে কিরূপে? সুতরাং তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া সেই বনমধ্যস্থ একটি সুবিস্তৃত বৃক্ষ তলে, পর্ণশয্যা রচনা করিয়া, রাত্রি যাপনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

---

(২)

বৃক্ষশাখায়, শুক ও সারী উপবিষ্ট ছিল। শুক ও সারী স্ত্রী পুরুষে, নিম্নলিখিত রূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল :—

সারী কহিল, "দেখ, ইহারা আমাদের আশ্রমে অতিথি হইয়াছে,—সমস্ত দিন উপবাসী,—অতএব, আমাদের সাধ্যমত অতিথি-সৎকার করা কর্ত্তব্য।"

শুক উত্তর করিল, "তা' সত্য বটে; কিন্তু আমরা সামান্ত বিহঙ্গ জাতি হইয়া, মানুষের কি উপকার করিতে পারি?"

সারী। "না পারিই বা কি? আমরা একটু চেষ্টা করিলেই ত অনায়াসে আগুনের উপযোগী কোন পদার্থ আনিয়া দিতে পারি; তার পর ইহারা আহারের যোগাড় করিয়া লইতে পারিবে।"

তাহাই স্থির হইল। শুক স্থানান্তরে গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃহৎ চঞ্চু দ্বারা এক খণ্ড অগ্নিজাত পদার্থ আনিয়া বৃক্ষের নিম্ন দেশে ফেলিয়া দিল। অতিথিদ্বয় অরণ্যের শুষ্কপত্র একত্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা আগুন প্রস্তুত করিল। কিন্তু অনেক অন্বেষণেও আহার মিলিল না দেখিয়া, তাঁহারা বিষণ্ণ অন্তরে বসিয়া রহিলেন।

সারী, শুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আগুন হইল বটে, কিন্তু এরা এখন খায় কি? আমাদের ত সংসারধর্ম্ম পালন করা চাই,—এক্ষণে যে কোন উপায়ে হোক অতিথিসৎকার করিতেই হইবে। অতএব আমি এই আগুনে পুড়িয়া মরি, তাহাতে ইহারা এক প্রকার আহারের সংস্থান করিতে পারিবে।"

শুক উত্তর করিল, "তুমিই যদি যাও, তবে আমারই বা বেঁচে থেকে কি লাভ! বিশেষতঃ, এরা দেখ্‌ছি দু' জন,—তোমার একার মাংসেই বা দুজনের কি হ'বে। অতএব আমিও দেহত্যাগ ক'রে অতিথির সেবা করি।"

তাহাই স্থির হইল;—উভয়েই এক সময়ে প্রজ্বলিত আগুনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, অতিথিসৎকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল। সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, কত ত্যাগ-স্বীকার—

কত সহিষ্ণুতা—কত ঔদার্য্য—কত মহত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়, তাহার অসাধারণ কীর্ত্তি ও আলৌকিক আদর্শ রাখিয়া, শুকসারী সংসারী ও সংসারধর্ম্মের প্রধান শিক্ষার স্থানীয় হইল।

---

(৩)

নির্দ্দিষ্ট আশ্রম অবলম্বনে অভিলাষী হইয়া, শিষ্যদ্বয় রাজকন্যার উদ্দেশে গুরুকথিত সেই নির্দ্দিষ্ট রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজপথের একস্থানে বিস্তর জনতা ও পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা কিছু কৌতূহলবশতঃ, তাহার কারণ নির্ণয়ে উৎসুক হইয়া, লোকপরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, সেই নগরের রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে ঈদৃশ লোকারণ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। নৃপতিকন্যার অঙ্গীকার এই যে, যে কোন ব্যক্তি অত্যুষ্ণ এক কলস জলে স্নান করিয়া, বেশ আরামের সহিত অবস্থান করিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন।

শিষ্যদ্বয় এই অবধি শুনিয়া, দ্রুতপদে বিবাহসভায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, সর্ব্বশ্রেণীরই অসংখ্য লোক তথায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। তাঁহারাও একস্থানে দাঁড়াইয়া, এই কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অনেকেই, 'রাজকন্যা লাভ করিব ও রাজ-জামাতা হইব' ভাবিয়া, উষ্ণ জলপাত্রের নিকট গমন করে, আর স্পর্শ করিতে-না-করিতেই, সন্ত্রাসে পশ্চাৎপদ হয়। এইরূপে সেই সর্ব্বগুণসম্পন্না পরম লাবণ্যবতী স্ত্রীরত্ন লাভে লোলুপ লইয়া, রাজাধিরাজ ও রাজকুমার হইতে,

নিম্ন-শ্রেণীর চির দরিদ্রাবস্থাপন্ন ব্যক্তি অবধি, প্রায় সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

(৪)

সগ্ন উত্তীর্ণ প্রায়।—কন্যার দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না দেখিয়া, রাজা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। এই সময়ে অকস্মাৎ এক গৈরিক বসনধারী, বিভূতি-পরিলেপিত, দণ্ড-কমণ্ডলু-শোভিত, সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে, আপনার সমস্ত গাত্রবস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক, রাজকন্যার প্রতিজ্ঞানুযায়ী সেই অত্যুষ্ণ জল-কলস গ্রহণ করিলেন। পরে অবলীলাক্রমে সেই অত্যুষ্ণ জলে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত পূর্ব্বক যথারীতি স্নান করিলেন।

সভাস্থলে উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ পড়িয়া গেল; চতুর্দ্দিক হইতে মাঙ্গলিক প্রথানুযায়ী, শঙ্খ ও হুলুধ্বনির গভীর নিনাদ গগন-মার্গ ভেদ করিল। অমনি শত শত স্ত্রী পুরুষ, সুসজ্জিতাবস্থায় সন্ন্যাসীর সম্মুখীন হইলেন; এবং নানাপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পাই-লেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষ এবংবিধ পার্থিব সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। রাজপুরুষগণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া অতি বিনয়-নম্রবচনে বিবাহে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যখন তিনি কোন

ক্রমেই সম্মত হইলেন না, তখন সকলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিল।

---

(৫)

বেগতিক দেখিয়া সেই আত্মচিন্তানিরত মহাপুরুষ ঊর্দ্ধশ্বাসে—যেন প্রাণের দায়ে, বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুরুষগণ, কেহ অশ্বারোহণে, কেহ বা দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিল। বিবাহ-সভায়-সমাগত, উপস্থিত দর্শকবর্গও তাহাতে যোগ দিল

অনেক পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি নিভৃত পর্ণকুটীরের সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ধৃত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই আখ্যায়িকার অন্তর্ভূত পূর্ব্বোক্ত সেই শিষ্যদ্বয়ও এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ সভায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবধি তাঁহাদের অন্তরে কিছু বিস্ময় ও কৌতূহল আবির্ভাব হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহাকে স্পষ্ট চিনিতে পারিয়া, আরও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন; কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

রাজপুরুষেরা সন্ন্যাসীকে পুনর্ব্বার বিবাহে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া, বিনয়-নম্র-বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "কেন বাপু, তোমরা নিরর্থক আমাকে কষ্ট দাও? আমি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণাভিলাষে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি নাই। দেখিলাম, সকলেই রণে ভঙ্গ দিতেছে, তাই কিছু কৌতূহলবশতঃ এবং আরও একটি বিশেষ কারণে, উষ্ণ জলে স্নান করিয়া-

ছিলাম মাত্র। আমি সন্ন্যাসী, আমার বিবাহে বা রাজৈশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি? কামিনী-কাঞ্চন সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রবল শত্রু। অতএব তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমাকে আর বিরক্ত করিও না।"

রাজ-অনুচরগণ অগত্যা বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন।

শিষ্যদ্বয় দেখিলেন এ সন্ন্যাসী আর কেহ নয়, তাঁহাদেরই গুরু। তাই তাঁহারা কিছু কৌতূহলভাবে—ঈষৎ হাসিতে হাসিতে গুরুকে প্রণাম পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভু! আপনি ও রাজকুমারী ত বিবাহব্যাপারে মত্ত, এক্ষণে আমরা কাহার নিকট, আমাদের জ্ঞাতব্য-বিষয় অবগত হই?—কে আমাদের উপযুক্ত আশ্রমঅবলম্বনের কথা বলিয়া দিবে?"

গুরুদেব তখন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কেন বাপু, তোমাদের আশ্রম অবলম্বনের কথা ত বলা হইয়াছে। যদি সংসারী হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে চাও, তবে অরণ্যমধ্যস্থ সেই শুকসারীর বিষয় চিন্তা কর; আর যদি সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করিতে বাসনা থাকে, তবে উপস্থিত যাহা প্রত্যক্ষ করিলে, এই মত কার্য্য করিও।"

(৬)

শিষ্যদ্বয় তখন নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে সবিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "প্রভু

যথেষ্ট হইয়াছে, আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। বুঝিলাম, আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের এখনও অবসান হয় নাই। চলুন গুরুদেব, আপনার আশ্রমে ফিরিয়া যাই। সংসার ও সন্ন্যাস—এই দুই আশ্রমের মধ্যে আমরা আজিও কোনটিরও উপযুক্ত হই নাই।—অদ্যাবধি আমরা, সংসার ও সন্ন্যাস—এ দুয়ের কোন ধর্ম্ম পালনে অধিকারী হই নাই।”

বস্তুতঃ হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয় এইরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষায় পূর্ণ বটে। পূর্ব্বে, গুরুগৃহে, ব্রহ্মচর্য্যরূপ জ্বলন্ত আগুনে বিশেষরূপে ‘পোড়’ না খাইয়া কেহ সংসারে প্রবেশ করিত না। পক্ষান্তরে সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণে অভিলাষী হইলে, সম্পূর্ণরূপে বিষয়স্পৃহাবর্জ্জন করিতে হইত। তখন গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, সেই অরণ্য মধ্যস্থ শুক শারীর ন্যায় আত্মোৎসর্গ ব্রত শিক্ষা করিতে হইত; আর সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইলে, তাহাকে সর্ব্ববিধ বিষয় স্পৃহাশূন্য হইতে হইত—এমন কি, অনায়াস লভ্য রাজ্য বা রাজকন্যাও তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। আর এখন?-এখন যেমন কাল, তেমনই ব্যবস্থা; যেমন শিক্ষা, তেমনই ফল, আর যেমন প্রাণ, তেমনই আত্মোৎসর্গ!—সবটাই গোঁজামিল! তা সে ‘গোঁজামিলের’ কথা তুলিয়া, এখানে সে আঁতের ব্যথা না দেখানই ভাল।





লোক-চেনা।

লোক-চেনা বড় কঠিন। প্রকৃত মনুষ্যত্ব সংসারে বড় বিরল। এই আখ্যায়িকাটিতে সেই কথাটিই আলোচিত হইতেছে।

---

(১)

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ একমুষ্টি উদরান্নের সংস্থানজন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ, কিছুতেই তাহার মনস্কাম পূর্ণ হইল না। ব্রাহ্মণের চারিটি অপোগণ্ড শিশু ও এক পতিব্রতা ঘরণী। তা এতগুলি পরিবারকে প্রতিপালন করা ত সহজ কথা নয়। ব্রাহ্মণ, অনন্যোপায় হইয়া, মহানগরীতে উপস্থিত হইল। যদি সেখানে কোন রকমে একটা চাকরি জুটাইতে পারে। কিন্তু মরুব্বি-সহায়হীন, অজানা-অচেনা, বাক্‌চাতুরী-বিবর্জ্জিত, পাড়াগাঁয়ে সরল ব্রাহ্মণকে খামকা কে কাজ দেয় বল? ব্রাহ্মণ একে একে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিল; এক এক করিয়া অনেক "বাবু-ভায়ের" শরণাপন্ন হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। লাভের মধ্যে ব্রাহ্মণের বহু কষ্টসঞ্চিত দুই চারি টাকার পুঁজিও নিঃশেষিত হইয়া গেল।

কাহারও নিকট কোনরূপ সমবেদনা না পাইয়া ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে বনবাসী হইল। ভাবিল,—"যাহার পয়সা নাই, তাহার লোকালয়ে বাস, বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাপেক্ষা সাপ-বাঘের মুখে প্রাণ যায়, সেও ভাল।"

(২)

একদিন বহু অরণ্য-পথ পরিভ্রমণ করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। আর দু'পা চলিবার সামর্থ্য রহিল না। এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে তৃণ-পত্র সংগ্রহ করিয়া, ব্রাহ্মণ শয্যা রচনা করিল। এবং জীর্ণ উত্তরীয়খানি বিছাইয়া তদুপরি শয়ন করিল। কিন্তু অনাহার বশতঃ নিদ্রা আসিল না,—ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

গাছের উপর শুক ও সারী বসিয়াছিল। এই ভয়াল হিংস্র-শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে, ব্রাহ্মণকে, এরূপ ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া সারী শুককে কহিল,—"আহা,দেখ দেখ, লোকটি কেমন অবস্থায় শুইয়া আছে! বুঝি, এখনই সাপ-বাঘের মুখে অভাগার প্রাণ যায়।"

শুক উত্তর করিল,—"ও ত মরিবে বলিয়াই মনের দুঃখে এখানে আসিয়াছে।"

এই বলিয়া, সেই ব্রাহ্মণের সংসারে কেন বিরাগ জন্মিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমূল বৃত্তান্ত সারীকে জ্ঞাপন করিল।

শুনিয়া সারী কহিল,—"তবে এক্ষণে উপায়? কি উপায়ে, গরীব ব্রাহ্মণ দু'মুঠা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে?"

শুক উত্তর করিল, "এ ব্রাহ্মণ ত মানুষের কাছে সাহায্য চায় নাই; সুতরাং সফলকাম হইবে কিরূপে?"

"কেন সংসারে কি মানুষ নাই?"

"মানুষ থাকিলে কি দয়াধর্ম্ম লোপ পায়?"

শুক-সারীর অনেক কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল, উহারা

আপনাদের পাখা হইতে যে 'পালক' ফেলিয়া দিবে, ব্রাহ্মণ তাহা ভস্ম করিয়া একরূপ কজ্জল প্রস্তুত করিবে এবং সেই কজ্জল চক্ষে দিয়া যে মানুষকে সে প্রথম দেখিতে পাইবে, তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেই সফলকাম হইবে।

ব্রাহ্মণ, বৃক্ষের নিম্ন হইতে এ সকল কথা শুনিতে পাইল। শুক-সারী আপন আপন পক্ষদেশ হইতে কয়েকটি পালক ফেলিয়া দিল; ব্রাহ্মণও, সাহ্লাদে, আশ্বস্ত হৃদয়ে, সেই পালক কয়টি সংগ্রহ করিয়া, উদ্দেশুসিদ্ধির জন্ম নগরাভিমুখে প্রবেশ করিল।

---

(৩)

যথাসময়ে, কজ্জল প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ চক্ষে লাগাইল। সেই কজ্জলের গুণে, ব্রাহ্মণ দিব্য চক্ষু লাভ করিল। সংসারে প্রকৃত মানুষ কে,—যথার্থ মনুষ্যত্ব কাহার আছে, এই কজ্জলের গুণে, তাহার পরীক্ষা হইবে।

প্রভাত হইবা মাত্র, ব্রাহ্মণ মহানগরীতে প্রবেশ করিল। প্রশস্ত রাজপথ; চারিদিক সুরম্য হর্ম্মাবলীতে সুশোভিত; কিন্তু একজনও মানবমূর্ত্তি ত ব্রাহ্মণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না! ব্রাহ্মণ, কিছু ভীত, চকিত, বিস্মিত ও মোহিত হইল;—"একি, এত বড় একটা সহরে, একটা মানুষ দেখিতে পাই না! শেষে চক্ষু দু'টিরও মাথা খাইলাম নাকি? কি ছাই-ভস্ম চোকে দিলাম!"

ব্রাহ্মণ, সন্দিগ্ধচিত্তে এইরূপ ভাবিতেছে; এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা প্রকাণ্ড "জুড়ী" ভূ-পৃষ্ঠ বিকম্পিত করিয়া

"হন্‌-হন্‌" শব্দে আসিতেছে। কিন্তু এ কি! সেই সুদৃশ্য "ফেটিং গাড়ী"র উপর, এ যে একটা প্রকাণ্ড বাঘ!

যাই গাড়ী খানা ব্রাহ্মণের সম্মুখবর্ত্তী হইল, অমনি "ত্রাহি মধুসূদন" রবে "বাপ, বাপ" বলিয়া ব্রাহ্মণ—দৌড়,—দৌড়,—দৌড়,—শেষ একেবারে অদৃশ্য!

(৪)

ক্ষণপরে, অন্য এক পথে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, একপাল অজাগর কেউটে ও গোখুরা ব্রাহ্মণের সম্মুখবর্ত্তী হইল। "বাবা গো, মাগো" রবে দারুণ আতঙ্কে, ব্রাহ্মণ সে পথ ত্যাগ করিল।

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, হস্তী, গণ্ডার, বরাহ, শূকর, গো, মহিষ, শৃগাল, কুকুর—পালে পালে ফিরিতেছে। তাহাদের উৎকট বিকট বীভৎসময় মূর্ত্তি ও ভয়াবহ রব শুনিয়া, ব্রাহ্মণ, ভয়ে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু হায়, এড়াইবার স্থান নাই;—ব্রাহ্মণ যে দিকে গমন করে, সেইদিকেই এই ভীষণ দৃশ্য! কোথাও পিশাচের থেই থেই থেই থেই নৃত্যোল্লাস; কোথাও শকুনি-গৃধিনী-ফেরুপালের হুড়াহুড়ি ও বিকট কোলাহল; কোথাও সিংহ ব্যাঘ্রের ঘোরতর দ্বন্দ্ব; কোথাও সয়তান সরীসৃপের কূট কৌশল-জাল,—সর্ব্বত্রই এই রূপ ভয়াবহ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণের অন্তরাত্মা মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল।

প্রাণ বাঁচাইবার আশায়, ব্রাহ্মণ এক ভজনালয়ে প্রবেশ করিল। কিন্তু একি,—ব্রাহ্মণ দেখিল, এখানেও এড়াইবার স্থান নাই; সভার চারিদিকে অম্বু, জম্বু, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ

লাঙ্গুল স্ফীত করিয়া যাইতেছে, আসিতেছে এবং বসিয়া আছে। তাহাদের সে সুমধুর কিচির-মিচির রব শুনিয়া ও মধুর মুখ-ভঙ্গিমা দেখিয়া ব্রাহ্মণ তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

এইবার এক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানেও ঐ দৃশ্য। স্বতন্ত্র আসনে শিক্ষক মহাশয়গুলি "বৈঠকী বাঁদরের" মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন; আর শিষ্যগুলিও, গুরুর কৃপালাভের আশায় 'গেছোবানরের' ন্যায় বিকট মুখ-ভঙ্গিমায় বসিয়া আছে।

ব্রাহ্মণ যথায় যায়, এইরূপ হরেক রকমের "চিড়িয়া" দেখিতে পায়। চিড়িয়াদের দৌরাত্ম্য ও একাধিপত্য দেখিয়া, ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে নগর ত্যাগ করিয়া ছুটিল। পথ চলিতে চলিতে ব্রাহ্মণ যে আরও কত শত অদ্ভুত রকমের চিড়িয়া দেখিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

(৫)

এইরূপে বেলা অবসান হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। নগর ছাড়াইয়া এক গ্রাম্যপথে প্রবেশ করিলে, ব্রাহ্মণ যেন 'ধড়ে প্রাণ' পাইল। কারণ, এস্থানে লোকের বসতি নাই।

অপরাহ্নে ব্রাহ্মণ, এক ক্ষুদ্র পল্লীর বাজারে উপস্থিত হইল। সেই ক্ষুদ্র পল্লীর বাজার প্রাতেই হইয়া থাকে; বৈকালে তথায় লোকের সমাগম হয় না। ব্রাহ্মণ, ধুকিতে ধুকিতে সেই স্থানে উপনীত হইল। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ অবধি একটিও মনুষ্য-মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ

একজন মানুষকে, ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইল। দেখিতে পাইল, এক ক্ষুদ্র কুটীরে এক চর্ম্মকার বসিয়া পাদুকা নির্ম্মাণ করিতেছে।

ব্রাহ্মণ, সাহ্লাদে, উৎসাহিত হৃদয়ে, তথায় উপস্থিত হইল। চর্ম্মকার, সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, ভক্তি পূর্ব্বক, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। পরে তাঁহার কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসিয়া বিনীত ভাবে কহিল, "মহাশয়ের কি প্রয়োজন?"

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। পরে কহিল,—"শুক-সারীর কথামত আমি এই কজ্জল চক্ষে দিয়াছি; তুমি জাতিতে চর্ম্মকার হইলে কি হইবে,—তুমিই যথার্থ মানুষ! আমি সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিলাম, কিন্তু সত্য বলিতেছি, একটিও মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই!—কেবলই সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, সর্প, সরীসৃপ, শকুনি গৃধিনী প্রভৃতি পশু পক্ষী দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বুঝিলাম, ভগবান সকলকে প্রকৃত মনুষ্যত্বটুকু দেন নাই। বুঝিলাম, ভাই! তুমিই আমার একমাত্র সুহৃৎ; তোমা দ্বারাই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ, পুনরায় তাহার দারিদ্র্য-দুঃখের কথা বর্ণন করিল। পুনরায় কহিল, "ভাই, তুমিই আমাকে সাহায্য কর।"

চর্ম্মকার সকল কথা শুনিল। কিছুক্ষণ মনে মনে কি ভাবিল। পরে একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি সমান্য ব্যক্তি; দু' এক জোড়া মাত্র পাদুকা সংস্কার ও নির্ম্মাণ করিয়া, জীবিকা-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমা হেন ক্ষুদ্র ব্যক্তি দ্বারা আপনি কি সাহায্য প্রার্থনা করেন?"

ব্রাহ্মণ, নিরস্ত হইল না। কহিল,—"হাঁ, তুমিই যথার্থ মানুষ,

চর্ম্মকারবেশে তুমি দেবতা! আমার অন্তরাত্মা যেন বলিতেছে, তোমাদ্বারাই আমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।”

চর্ম্মকার কহিল,—“ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার কথাই সফল হয়।”

তারপর মনে মনে কহিল,—“হরি হে! তুমিই দয়া করিও। আমার কোন ক্ষমতাই নাই, প্রভু!”

চর্ম্মকার একটি ক্ষুদ্র থলি হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিল। কহিল,—“ঠাকুর, আমি নীচ জাতি; দয়া করিয়া আপনি নিজে জলযোগের সংস্থান করিয়া লউন।”

(৬)

যথাসময়ে, চর্ম্মকার, বহুপরিশ্রমে ও ঐকান্তিক যত্নে, একযোড়া অতি উৎকৃষ্ট, মহা শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত পাদুকা প্রস্তুত করিল। এবং সেই পাদুকা, দেশের বাদসাহকে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়া দিল। বাদসাহ, এবংবিধ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যময় পাদুকা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কারিকরকে লক্ষটাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা করিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, যথাসময়ে চর্ম্মকার, বাদসাহ সমীপে আনীত হইল, এবং সেই লক্ষ টাকা, সেই ব্রাহ্মণকেই দান করিল। ব্রাহ্মণ, অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু চর্ম্মকার তাহা হইতে একটি পয়সাও গ্রহণ করিল না। কহিল,—“আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, এই বিনামা হইতে যাহা কিছু পাইব, তাহাই আপনাকে

দিব। অতএব এ সমস্ত অর্থই আপনার। আমি ইহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না। ইহা হইতে একটি পয়সা গ্রহণ করিলেও আমি সঙ্কল্পচ্যুত হইব। সঙ্কল্প-চ্যুতিতে আমার পাপ স্পর্শিবে,—দেবতার কাজে আর আমার অধিকার থাকিবে না।"

বাদসাহ, একে একে সকল কথা শুনিলেন। চর্ম্মকারের অসাধারণ ধর্ম্মভাব ও অদ্ভুত পরার্থ পরতা দেখিয়া, বাদসাহ বিস্মিত হইহেন। ভাবিলেন,—"ধর্ম্ম ও চরিত্রের দৃঢ়তা যাহার নাই, সত্যই সে মনুষ্যাবয়বে পশু।"

বস্তুতঃ, ভিতরের দিক দিয়া দেখিয়া, লোকের গুণাগুণ বিচার করিলে, "দেবধর্ম্মী" বা "মানবধর্ম্মী" অপেক্ষা "জন্তুধর্ম্মীর" ভাগই সংসারে অধিক,—অত্যন্ত অধিক।





ঈশ্বর মঙ্গলময়।

"ঈশ্বর মঙ্গলময়"—এ বড় খাঁটী কথা। প্রকৃত ভক্ত ভিন্ন এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।—বলিতে পারে না অর্থ,—হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। মায়ার জীব মায়ায় মুগ্ধ,—প্রকৃত মঙ্গল বা অমঙ্গল নিরূপণ করা তাহার পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বিশ্বাসীর নিকট জগতের সকল কার্য্যই মঙ্গলময় বোধ হইয়া থাকে। এরূপ মহামহিমময় ধর্ম্মজীবন সকলেরই আলোচনীয়। এই গল্পটিতে তাহাই আলোচিত হইবে।

---

(১)

কোন দেশে এক সমৃদ্ধিশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার একমাত্র গুণধর পুত্র ছিলেন। সেই পুত্র অকালে সকলকে ফাঁকি দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রাজপরিবারের মধ্যে হাহাকারের রোল পড়িয়া গেল। নৃপতি, প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রবিরহে জগৎসংসার অন্ধকার দেখিলেন। রাজকার্য্য ও রাজ্যপালন তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। বৈষয়িক সকল কার্য্যই তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। তিনি বহির্জগৎ হইতে এককালে বিদায় লইয়া, নিরন্তর ক্ষুণ্ন মনে বিরলে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

রাজাকে এইরূপ শোকমুহ্যমান দেখিয়া একদিন মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! নিরর্থক কেন মনকে কষ্ট দেন? ঈশ্বর মঙ্গলময়; তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই নাই। তিনি যা করেন, সকলই মঙ্গলের জন্য। আপনি প্রাণাধিক পুত্রবিরহে আত্মহারা হইয়াছেন; কিন্তু আপনার পুত্রের অকাল মৃত্যুই মঙ্গলের কারণ জানিবেন! ইহাতে আপনার ও রাজপরিবারবর্গের মঙ্গল সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।"

দারুণ দুঃখের সময়ে, মন্ত্রীর এইরূপ কঠোর সত্য কথা শুনিয়া, রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্ষিপ্তপ্রায় কহিয়া উঠিলেন,—"কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার সম্মুখেই আমার পুত্রের নিধনে আনন্দপ্রকাশ করিতেছিস্? দুরাত্মন! অবিলম্বে এ ধৃষ্টতার ফল ভোগ কর্।"

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ জল্লাদকে আহ্বান করিয়া শূলদণ্ডে হতভাগ্য মন্ত্রীর প্রাণনাশের আদেশ দিলেন। রাজাদেশে, জল্লাদ তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে লইয়া বধ্যভূমিতে উপনীত হইল এবং কহিল,—"মন্ত্রীন্! একদিন আপনি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু আজ বিধির বিপাকে, আমাদের হস্তেই আপনার প্রাণসংহারের আদেশ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি এক কাজ করুন। অদূরস্থিত ঐ বনপথ ধরিয়া ছদ্মবেশে, অন্য রাজ্যে পলায়ন করুন। আমি একটি কুক্কুরের প্রাণসংহার করিয়া, তাহার রক্ত লইয়া গিয়া রাজাকে বুঝাইব যে, আপনাকে বিনাশ করিয়াছি। কিন্তু সাবধান, আপনার জন্য যেন আমার গর্দ্দানাটি দিতে না হয়!"

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী "জয় ঈশ্বর মঙ্গলময়" বলিয়া জল্লাদকে

আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং তাহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া, তাহার পরামর্শমত ছদ্মবেশে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জল্লাদ যথাসময়ে একটা কুকুরের প্রাণসংহার করিয়া সেই রক্ত লইয়া গিয়া শোকোন্মত্ত রাজাকে বুঝাইল যে, সে রাজাদেশ পালন করিয়াছে।

---

(২)

কিছু দিন যায়,—একদা ভিন্নদেশীয় এক বাদসাহের সহিত রাজার মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। বিবাদ ক্রমশই গুরুপাকে দাড়াইল। শেষে উভয়পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বাদসাহের বাহুবল অপরিসীম,—সে তুলনায় রাজার খুবই কম। সুতরাং রাজার পক্ষে অনেক সৈন্যসামন্ত নিহত হইল, নররক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত হইল, পরিশেষে বাদসাহেরই জয় হইল। রাজা রাজ্যভ্রষ্ট, পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। দেশ মুসলমানের অধিকৃত হইল।

রাজ্য জয় করিয়া বাদসাহ কিছুদিন পরমসুখে জীবন অতিবাহিত করিলেন। একদা তাঁহার পুত্রের এক উৎকট রোগ জন্মিল। মুসলমান হাকিম চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যায়, কিন্তু রোগের কোনরূপ উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে বাদসাহ-পুত্রের জীবনসংশয় হইল। এইবার অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, রোগের আনুপূর্ব্বিক লক্ষণ দেখিয়া সেই হাকিম ব্যবস্থা করিলেন যে, সুস্থকায়, নীরোগ, চিরপ্রফুল্ল, মানসিক-শোক-তাপ-বর্জ্জিত কোন লোকের

প্রাণসংহার করিয়া, সেই রক্ত বাদসাহপুত্রের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন,—নচেৎ এ যাত্রা আর কিছুতেই তাঁহার রক্ষা নাই।

হাকিমের ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ হইলেই চারিদিকে লোক ছুটিল,—কোন্ স্থানে এরূপ লোক মিলিতে পারে, তাহার সন্ধান চলিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্ম্মচারীগণ কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিল না,—তাহারা কোন স্থানেই এরূপ শোকতাপবর্জ্জিত একটিও লোক পাইল না;—দেখিল, সকলেই একটা-না-একটা শারীরিক বা মানসিক রোগে দুঃস্থ ও অপ্রফুল্ল। শেষে, অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, সম্প্রতি যে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বন্দী করা গিয়াছে, তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেই এ কার্য্য সিদ্ধ হইবে; যেহেতু, রাজদেহ অবশ্যই নীরোগ ও সুস্থকায়; অধিকন্তু শারীরিক বা মানসিক কষ্ট, কিংবা কোনরূপ শোকতাপ তাঁহাকে বেশী স্পর্শ করে নাই; অতএব এই রাজ-রক্তেই বাদসাহপুত্রের জীবন রক্ষা হইতে পারে।

---

(৩)

এইরূপ স্থির করিয়া কর্ম্মচারীগণ বাদসাহকে এ কথা জ্ঞাপন করিল। বাদসাহও "উত্তম সংকল্প হইয়াছে" বলিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিলেন। কর্ম্মচারীগণ কারাগারে প্রবেশ করিল। সঙ্গে একজন মুসলমান হাকিমও রহিল। রাজা যথায় বন্দী দশায় অতি মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন, তাহারা সেইখানে উপস্থিত হইল। চিকিৎসক রাজাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা

করিতে লাগিলেন,—জীবনে তিনি শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ ব্যাধি কিংবা শোক-তাপ পাইয়াছেন কি না। কিন্তু চিকিৎসকের পরীক্ষা ব্যর্থ হইল। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"পুত্রশোকে আমার শরীর জর্জ্জরিত; আমার রক্তে বাদসাহ-পুত্রের জীবন রক্ষা হইবে না। নচেৎ আমি অম্লান বদনে এ দুর্ব্বহ জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম।"

কর্ম্মচারীগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া বাদসাহসমীপে উপনীত হইল এবং হতাশভাবে কহিল,—"জাঁহাপনা, আমরা কোথাও চিরপ্রফুল্ল ও শোকতাপ হীন মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। এ সংসারে বুঝি, শোক-তাপহীন মনুষ্য একবারেই নাই!"

বাদসাহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"বুঝিয়াছি, খোদা আমার প্রতি বাম; প্রাণাধিক পুত্র বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়া চলিল।"

তদনন্তর কি ভাবিয়া কহিলেন, "তবে আর অনর্থক ঐ রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া ফল কি? উহাকে মুক্ত করিয়া দাও। পুত্রশোকের কল্পনায় আমি অধীর হইয়াছি। আর! ঐ হতভাগ্য সেই পুত্রশোকে জর্জ্জরিত! উহার প্রাণনাশে অধর্ম্ম আছে।"

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ রাজাকে মুক্ত করিয়া দিতে অনুমতি দিলেন। এবং তৎসঙ্গে কি ভাবিয়া রাজার রাজ্যও প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজাকে কহিলেন, "যাও, আজ হইতে তুমি আমার সুহৃৎ। আজ হইতে তোমার ও আমার রাজ্য মিত্ররাজ্য হইল। প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া কুশলে রাজধর্ম্ম পালন কর।"

রাজাও, যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৪)

এইবার রাজার চমক ভাঙ্গিল। এইবার তাঁহার সেই হিতভাষী মন্ত্রীর জন্য প্রাণ কাঁদিল। ঈশ্বর মঙ্গলময়—তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্য,—এতদিনে তিনি বিশেষরূপে এই ধ্রুব-সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ভাবিলেন, মন্ত্রী আমায় সত্যই বলিয়াছিল,—"মহারাজ পুত্রবিরহে খেদ করেন কেন? ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য!" সত্য,—মন্ত্রীর বাক্য অতি সত্য। যদি পুত্রশোকে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত না হইত, তাহা হইলে ত আজ বাদসাহের আজ্ঞাক্রমে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ যাইত।—পুত্রস্নেহ কি, না বুঝিলে, বাদসাহও আমার দুঃখে দুঃখিত হইতেন না, কিংবা আমাকে মুক্ত করিয়া আমার রাজ্যও আমায় প্রত্যর্পণ করিতেন না। বুঝিলাম, মন্ত্রীর বাক্যই আমার বেদবাণী।"

মন্ত্রী বিরহে রাজা অধীর হইলেন।—সেই মন্ত্রীকেই আবার তিনি শূলদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন! তাঁহার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

এই সময় জল্লাদ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—"মহারাজ, দাসের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না,—আমি মন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়াছি।"

রাজা, তৎক্ষণাৎ সেই জল্লাদকে পুরস্কৃত করিলেন এবং রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন,—"যে ব্যক্তি আমার মন্ত্রীকে আনিয়া দিতে পারিবে, কিংবা তাঁহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিব।"

দেশ দেশান্তরে লোক ছুটিল। শেষে বীরবল নামক এক নাগরিক মন্ত্রীর সন্ধান পাইলেন।

(৫)

মন্ত্রীর অবস্থা তখন অতি হীন। সামান্য জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে অতি নীচকর্ম্ম করিতে হইতেছে। অবস্থাগুণে তাঁহার আকৃতির এবং বেশ ভূষারও বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। কিন্তু বীরবল মন্ত্রীকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল। দূর হইতে দেখিল, মন্ত্রী মহাশয় এক ঢেঁকিশালে, ঢেঁকির উপর পা দিয়া চিড়া কুটিতেছেন। বীরবল দূর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। হাসিতে হাসিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, "কি মন্ত্রী মহাশয়, আমাকে চিনিতে পারেন কি ?—এ কি হইতেছে ?"

মন্ত্রী মহাশয়ও তদবস্থায় কহিলেন,—"হইবে আর কি ? নারায়ণ যখন যেমন রাখেন, তখন তেমনি থাকি।—উপস্থিত এই ঢেঁকিতে চিড়া কুটিতেছি।"

যথাসময়ে বীরবল মন্ত্রীকে একে একে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। মন্ত্রী রাজসমীপে আনীত হইলেন। রাজা, মন্ত্রীকে দেখিতে পাইয়াই, ব্যাকুলভরে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহ প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। পরে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"মন্ত্রিন্! আমার সকল অপরাধ বিস্মৃত হও। সত্যই বুঝিয়াছি, ঈশ্বর মঙ্গলময়,—তিনি যা কিছু করেন, সকলই মঙ্গলের জন্য।"

মন্ত্রীও আনন্দিত হইয়া, প্রেমভরে কহিয়া উঠিলেন,—"ঈশ্বর যে মঙ্গলময়, তাহা কি মহারাজ একবার বলিতে ? আপনি কেন আমার নিকট লজ্জিত হইতেছেন ? আপনা হইতে যে আমি নির্ব্বাসিত হই, তাহাও মঙ্গলের জন্য। ভাবিয়া দেখুন, বাদসাহের সহিত আপনার যুদ্ধকালে যদি আমি

আপনার মন্ত্রী থাকিতাম, তাহা হইলে আপনার সহিত আমাকেও বন্দী হইতে হইত। তারপর ভাবিয়া দেখুন, চিরপ্রফুল্লিত ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতে পারিলেই বাদসাহপুত্রের জীবন রক্ষা হইত। কারাগারে থাকিলে, আপনার সহিত আমারও পরীক্ষা হইত। আপনি মুক্ত হইতেন,—কিন্তু এ হতভাগ্যের নিশ্চয়ই প্রাণ যাইত। কারণ ঈশ্বরেচ্ছায়, এ দাস কস্মিন্‌কালে, কোন কিছুতেই শান্তিহারা হয় নাই। অতএব ঈশ্বর যে মঙ্গলময়,—তিনি যা করেন, তাহা যে মঙ্গলের জন্য, এ কথার আর কথা কি, মহারাজ?”

তখন রাজার সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য হইল। তিনি আনন্দ-বিহ্বল-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে “জয় ঈশ্বর মঙ্গলময়, জয় মঙ্গলালয়” বলিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার মন্ত্রী মনুষ্যবেশে দেবতা।

বলা আবশ্যক, এই দেব-চরিত্র মন্ত্রীর সহবাসে কালে সেই রাজারও দেবত্ব লাভ হইল।

সমাপ্ত।





মঙ্গল ও অমঙ্গল।

পাঠক, এই আখ্যায়িকাটিতেও মঙ্গল ও অমঙ্গলের আর একটি চিত্র দেখুন।

---

(১)

একদা কোন মহাপুরুষ ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। পথিমধ্যে একটি লোক তাঁহার অনুসরণে একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিল। নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি শেষে সেই লোকটিকে সঙ্গে লইয়া এই কথা বলেন,—"দেখ বাপু, আমার সঙ্গে এস, ক্ষতি নাই! কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, আমি যাহা করিব, তাহাতে ভাল-মন্দ কোন কথা কহিতে পারিবে না।"

লোকটি তাহাতেই সম্মত হইয়া, তাঁহার সহিত অনেক স্থান ভ্রমণ করিল। পরিশেষে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া তাঁহারা এক বিশিষ্ট ধনীর আলয়ে আতিথ্য-স্বীকার করিবার মানসে দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং আপনাদের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। বাবুর কিন্তু তাহাতে হুকুম হইল,—"এ দরোয়ান, এস্কো নেকাল দেও।"

এ কথায় পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ উত্তর করিলেন,—"ভগবান তোমায় আরও বড় করুন, তোমার আরও ঐশ্বর্য্য হোক!"

স্থূলোদর বাবুটি এ গভীর ভাবার্থ না বুঝিয়াই, উপহাসচ্ছলে অতিথিদ্বয়কে তাড়াইয়া দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও, সেই ছদ্মবেশী সাধুর এই আশীর্ব্বাদ বাক্যে কিছু অসন্তুষ্ট হইল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে তাঁহারা এক তৃণপত্রাচ্ছাদিত ভিখারিণীর কুটীরে আশ্রয় লইলেন। দরিদ্রা সরল অন্তরে, হৃষ্টমনে যথাসাধ্য অতিথি-সৎকার করিল। অতিথিদ্বয়ের বিদায়কালে ঐ বৃদ্ধা ভক্তিভরে প্রণাম করিলে পর, সেই ছদ্মবেশী মহাত্মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"দেখ্ বাছা,তোকে আমি এই আশীর্ব্বাদ করি, যেন ত্বরায় তোর এই শিশুটির মৃত্যু হয়।"

---

(২)

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম হইতেই কিছু চটিয়াছিল, কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ কোন কথা কহে নাই। কিন্তু এক্ষণে সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, বিলক্ষণ ক্রোধভরে সেই ছদ্মবেশী মহাত্মাকে কহিল, "এই বুঝি ঠাকুর তোমার ধর্ম্মজ্ঞান? বুজ্রুকি-ভণ্ডামী যত জান বইত নয়! ভালর ত কাল নেই! ক্ষিদের নাড়ী বাপন্তক'চ্ছেলো,—তখন বড়-মানুষের দরজায় গলাধাক্কা খেয়ে তাকে বর দেওয়া হলো কিনা,-'তুমি আরও বড় হও!' আর এ বেচারি—আহা, খাইয়ে জান্‌রাখ্‌লে,—এরে আশীর্ব্বাদ করা হলো কিনা,-'তোর ছেলেটা শীগ্‌গির মরুক।' যা'হোক ঠাকুর, এইজন্যেই বুঝি আমাকে ব'লেছিলে যে, তুমি যা' করবে, তাতে কোন কথা কইতে পার্‌বো না?"

ইহাতে সেই সুদূরদর্শী, সংযতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ একটু হাসিয়া

কহিলেন,—"হাঁ, বাপু, আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে, তুমি এরূপ করিবে। মনে পড়ে কি?—সেইজন্যই তোমাকে আমার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।"

এইরূপ দুই এক কথার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি একটু নরম হইয়া কহিল,—"তা এক্ষণে আমায় এ কথাটার অর্থ বুঝাইয়া দিন। আপনি কেন ঐ বড় মানুষকে আরও বড় হইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—আর এই ভিখারিণীকেই বা কেন এমন মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাৎ করিলেন?"

তখন সেই মহাপুরুষ কহিলেন,—"দেখ, ভগবান্ যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহার অবশ্যই একটা সীমা আছে। আমার, ঐ ধনীকে অধিক সুখী হইতে আশীর্ব্বাদ করিবার কারণ এই যে,—উহার যতটা সুখ, অল্প সময়েই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। যেমন এক প্রদীপ তেল সাধারণতঃ ৩।৪ ঘণ্টা কাল পুড়িতে পারে, কিন্তু দুই কিংবা ততোধিক বর্ত্তিকা সহযোগে তাহা অল্প সময়ে নির্ব্বাণ হইয়া যায়; তদ্রূপ ঐ ধনীরও ঐ নশ্বর সুখ, যদি দশ বৎসর সম্ভোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে আমার আশীর্ব্বাদে ঐ পাষণ্ড নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় বিকট হাসি হাসিয়া অল্প সময়েই চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। আর, ঐ যে ধর্ম্মভীরু দরিদ্রা নারী, কালে এই বৃদ্ধা,—উহার ঐ আপাতঃনয়নরঞ্জন—কুসুমাচ্ছাদিত ভুজঙ্গ শিশু দ্বারা এ মহান্ ধর্ম্মপথ হইতে সুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। আমি যোগবলে ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই, এই অতীব শুভ আশীর্ব্বাদ—ঐ শিশুর মৃত্যু কামনা করিয়াছি!"

সমভিব্যাহারী লোকটির তখন অবশ্য চৈতন্য হইল। গুরু ভিন্ন ভ্রান্ত জীবকে প্রতি হাতে আর কে শোধ্‌রাইয়া দিতে পারে?



পূর্ণচন্দ্র

(১)

শালিবান শ্যালকোটের রাজা। ইচ্ছ্রা তাঁহার প্রথমা মহিষী। রাজা বহুদিন অপুত্রক থাকেন। মহিষী ইচ্ছ্রা, ভগবান শিবসন্নিধানে অহর্নিশ পুত্র-কামনা করেন। বহু দিন পরে জনৈক সিদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া রাণীকে আশ্বাস দিলেন যে, শিব-চতুর্দ্দশী ব্রত পালন করিলে তিনি পুত্রবতী হইবেন। রাজমহিষীও যথারীতি বর্ষত্রয় উক্ত মহাব্রত পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। রাজারাণী উভয়েই সন্ন্যাসি-বাক্যে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। কিছুদিন পরে আবার সেই সিদ্ধ যোগি-পুরুষ উদ্যান-মধ্যে রাজা ও রাজমহিষীকে দেখা দিলেন; জলদগম্ভীরস্বরে রাণীকে কহিলেন,—"তুমি দেব-বাক্যে অবিশ্বাস করিয়াছ, ইহার মার্জ্জনা নাই। অবশ্য সর্ব্বসুলক্ষণ-যুক্ত সুসন্তান তুমি লাভ করিবে বটে;—কিন্তু বিধাতা বিমুখ,—পুত্রলাভ করিয়াও, তোমায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।"

তৎপরে রাজাকে কহিলেন,—"তোমারও ইহাতে মার্জ্জনা নাই; তুমিও দ্বাদশ বৎসর স্ত্রী ও পুত্রমুখ দেখিতে পাইবে না। ইহার অন্যথা করিলে, তোমাকে অকালে জীবন হারাইতে হইবে।"

যথাসময়ে তাঁহারা এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। রাজার মঙ্গল কামনায়, রাজমহিষী পুত্রকে লইয়া দ্বাদশ বৎসর নির্জ্জন-উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দীর্ঘকালের মধ্যে রাজা একদিনও মহিষীকে দেখিতে পান নাই।

(২)

একদিন রাজা মৃগয়ার উদ্দেশে গমন করিতেছেন, পথে এক ভুবনমোহিনী মোহিনীমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন মন আকর্ষণ করিল। কামোন্মত্ত রাজা কিছুতেই সে রূপ-তৃষ্ণা সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাহাকে রাজধানীতে আনিয়া অতি গোপনে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন। কেবল মন্ত্রী মাত্র এই বিবাহের কথা জানিতে পারিলেন। রাজার এই বিবাহের কথা গোপন করিবার কারণ এই,—সেই সুন্দরী ঘৃণিত চামার-বংশসম্ভূতা। নীচ কুলে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে শুনিলে সাধারণে অবশ্যই রাজার অপযশ ঘোষণা করিবে। তাই তিনি এ বিবাহ গোপন রাখিলেন। শ্যালকোটাধিপতির এই দ্বিতীয়া মহিষীর নাম—লুনা।

যথা সময়ে দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। এই সময়ের মধ্যে, মহিষী ইচ্ছ্রা, 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' এবং 'সংসার অতি কুটিল' বুঝাইয়া, পুত্রকে বড়ই ধর্ম্মবিশ্বাসী করিয়া তুলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে, মহিষী ইচ্ছ্রা ও পুত্র পূর্ণচন্দ্র রাজপুরীতে আনীত হইলেন। রাজার আদেশ অনুসারে রাজদূত আসিয়া কুমার পূর্ণচন্দ্রকে রাজসমীপে লইয়া যাইতে চাহিল। মহিষী

ইচ্ছা পুত্রকে যাইতে অনুমতি দিলেন। সর্ব্বমাঙ্গল্যে অটল বিশ্বাসী পূর্ণচন্দ্রও পিতৃদর্শন করিয়া, পিতার চরণ বন্দনা করিলেন।

এই সময়ে দ্বিতীয়া মহিষী লুনাও কুমার পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে চাহিল। রাজা বিষম বিপদে পড়িলেন। এতদিনে তাঁহার গুপ্তবিবাহ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল। তিনি মহিষী ইচ্ছার নিকট ইহার জন্য মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পতিব্রতা সতী স্বামীর দোষ ত গ্রহণ করিলেনই না,—অধিকন্তু তিনি হৃষ্টচিত্তে পূর্ণচন্দ্রকে বিমাতার চরণ বন্দনা করিতে অনুমতি দিলেন।

এদিকে লুনা ও তাহার পিশাচ-হৃদয় পিতা জম্বু রাজপুত্রের বিরুদ্ধে নানা অহিত চেষ্টা করিতে লাগিল। দারুণ হিংসা-বৃত্তির উত্তেজনায় তাহারা পূর্ণচন্দ্রের বিনাশোপায়ে বদ্ধপরিকর হইল। সতীন-পুত্র জীবিত থাকিতে বিমাতার কিছুতেই সুখ নাই,—পিতার উপদেশে লুনা সম্যক্‌রূপে এভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিল।

যথাসময়ে পূর্ণচন্দ্র বিমাতার চরণ বন্দনা করিতে আসিলেন। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের অলোক-সামান্য রূপমাধুরী দেখিয়া, পাপিষ্ঠা লুনার মনে পাপ-ইচ্ছা বলবতী হইল,—মাতা-পুত্র সম্বন্ধ ভুলিয়া সেই দুর্বৃত্তা পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উন্মত্তপ্রায় হইল। প্রথমে বিনয় নম্র বচনে—অনুরোধে, শেষে বলপূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিতে, সেই পাপীয়সী কৃতসঙ্কল্পা হইল। সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাসী নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সেই সর্ব্ব মঙ্গলময়কে প্রাণের ব্যাকুলতায় ডাকিতে লাগিলেন। সংসার-প্রবেশের প্রথম দিনে—প্রথম পদক্ষেপেই এই ভীষণ পাপের বিভীষিকাময় ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া

তিনি অধীর হইলেন। সেই সর্ব্ববিপদভঞ্জনকে ডাকিতে ডাকিতে "মা—মা" রবে, তিনি অতি দ্রুতপদে, সেই পাপ-কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

(৩)

এইবার পূর্ণ মাত্রায় বিষ ধরিল। নির্ম্মম-প্রতিহিংসা-বৃত্তি এইবার সাংঘাতিকরূপে লুনার হৃদয় অধিকার করিল। কারণে কার্য্যের সংযোগ—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। আঘাতিতা কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় লুনা অতি ভীষণ মূর্ত্তিতে আততায়ীকে দংশন করিবার সঙ্কল্প করিল। বেশ্যাসুলভ চাতুরীতে পাপিষ্ঠা লুনা রাজার নিকট ঠিক বিপরীত ভাবে এ ঘটনাটি বিবৃত করিল। অর্থাৎ, সেই সয়তান সদৃশ সতীনপুত্র তাহার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অদূরদর্শী, সন্দিগ্ধচিত্ত, কামুক রাজার অন্তরে অতি সহজেই তাহা বিশ্বাস হইল। লুনার অভিপ্রায়ানুসারে পূর্ণচন্দ্রকে অন্ধকূপে ফেলিয়া বধ করাই যুক্তিসিদ্ধ হইল। মহিষী ইচ্ছ্রা বিস্তর বাধা দিলেন, বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিলেন; ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রার্থনা করিয়া পুত্রের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না।

এইবার ইচ্ছ্রার 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে' বিশ্বাস টলিল। তিনি সেই সন্ন্যাসী বাক্য বিস্মৃত হইলেন। ইহাতে সেই তত্ত্বজ্ঞানী পূর্ণচন্দ্র মাতাকে বুঝাইলেন,—"মা কাঁদ কেন? এ সংসার পরীক্ষার স্থল। ঈশ্বর অবশ্যই মঙ্গলময়; তিনি যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই। অতএব মা, ভগবানের কার্য্যে বিশ্বাস হারাইও না।"

বস্তুতঃ, সেই অমানুষী বিশ্বাসবলে বলীয়ান্ পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়, ইহাতেও ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইল না। তিনি মুক্তকণ্ঠে মঙ্গলময়ের মহিমা গান করিতে করিতে কূপে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই, ভগবান্ গোরক্ষনাথ (শিবের অবতার) সশিষ্য সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার জনৈক শিষ্য সেই কূপ হইতে জল আনিতে গিয়া অস্ফুট কাতরোক্তি শুনিতে পাইলেন। পরে সকলে বুঝিলেন, এই কূপ মধ্যে কোন দুর্ভাগ্য জীব পতিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথের আদেশে পূর্ণচন্দ্রকে সেই কূপ হইতে উত্তোলন করা হইলে গোরক্ষনাথের কৃপায় পূর্ণচন্দ্র আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়া গোরক্ষনাথ তাঁহার প্রতি সদয় হইল। ভক্ত সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া, সুকুমার যৌবনেই গুরু গোরক্ষনাথের নিকট যোগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

(৪)

সেই সময়ে পঞ্চনদস্থ স্বাধীনরাজ্যের রাণী সুন্দরা দেবী, কুমারী অবস্থায়, জনৈক সহচরীসমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে নানা দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন। মনোমত স্বামী-লাভে বঞ্চিতা হইয়া, সুন্দরা এতাবৎকাল অবিবাহিত রহিয়াছেন। এখন, অন্তর্যামী গোরক্ষনাথ, প্রিয় শিষ্য পূর্ণচন্দ্রকে পরীক্ষার্থ, কৌশল করিয়া সুন্দরার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই যাহার ভগবানের প্রতি প্রাণ টানিয়াছে, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে কা'র সাধ্য? কামিনী-কাঞ্চনের সম্পূর্ণ প্রলোভনেও,

কিছুতেই পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি কিছুদিনের জন্য সংসারী হইলেন বটে; কিন্তু সে সংসারী হওয়াও, যোগ-ধর্ম্ম সাধনের প্রথম সোপান। অবশেষে কোন প্রকারে সুন্দরার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, পরম জ্ঞানী পূর্ণচন্দ্র আবার গুরুপদ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পতিপ্রাণা সতী সুন্দরা, স্বামী-সহবাসে বঞ্চিত হইয়া, হিন্দুস্ত্রীর অন্য কর্ত্তব্য সাধন করিলেন,—পূজনীয়া শ্বশ্রুঠাকুরাণীর চরণ-সেবা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি অবগত ছিলেন যে, রাজা শালিবান দ্বিতীয়া মহিষীর কূট-মন্ত্রণায় পুত্রকে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, প্রথমা মহিষীকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। অভাগিনী মহিষী অন্ধ ও পাগলিনী হইয়া তথায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। সুতরাং তিনি শ্যাল-কোটে আসিয়া, দূতদ্বারা রাজ-সকাশে জানাইলেন যে, হয় তিনি প্রথমা মহিষীকে কারাগার হইতে অব্যাহতি দিন,—নয় রাণী সুন্দরা দেবী সসৈন্যে তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন।

পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল; সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রাজা শালিবান সহজেই সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সুন্দরা দেবী তখন ছদ্মবেশে, স্বয়ং দাসী-ভাবে, সেই উদ্যান-বাটীতে শ্বশ্রুঠাকুরাণীর পদ-সেবা নিযুক্ত হইলেন।

---

(৫)

পাপের শেষ দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সকলই সম্ভবে। পাপীয়সী লুনা, অতঃপর তাহার পিতার পরামর্শ মতে রাজাকে বিষ প্রদানে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল। ইতি-

পূর্ব্বে এই পাপিষ্ঠা গোরক্ষনাথের জনৈক শিষ্য—সেবাদাসের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। সেবাদাস নানাবিধ বিষ প্রস্তুত করিতে জানিত। তন্মধ্যে একটি বিষের গুণ এই যে, তাহা পান করিলে, দুই, চারি, বা ছয় মাসে ক্রমশঃ শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ নষ্ট হয়। সেবাদাসের সহিত প্রণয়কালে লুনা একদিন সেই বিষবটিকা অপহরণ করিয়াছিল। এখন জম্বুর পরামর্শানুসারে পাপিষ্ঠা কৌশলে সেই বিষ রাজাকে খাওয়াইয়া দেয়। রাজাও সেই বিষপানে ক্রমশঃ জর্জ্জরিত হইতে থাকেন। বিষ চুরীর বিষয় জানিতে পারিয়া সেবাদাস ক্রোধান্ধ হইয়া, তপ্ত লৌহ-শলাকায় লুনার পৃষ্ঠদেশে ইতিপূর্ব্বে "চোর" নাম অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। এখন রাজা শালিবান্ সেই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত! পিশাচীর চাতুরীতে পড়িয়া আজ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগতপ্রায়! দেশ-দেশান্তর হইতে কত বৈদ্য, কত চিকিৎসক আসিল, কিন্তু কেহই রোগের কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। রাজা, জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন।

---

(৬)

ক্রমে ভগবান্ গোরক্ষনাথের মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইয়া আসিল। শিষ্য পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা পৃথিবীতে 'যোগ-ধর্ম্ম' প্রচার হইতেছে বুঝিয়া, তাঁহার কার্য্য তিনি শেষ করিলেন।—তিনি সশিষ্যে শ্যালকোটে উপনীত হইয়া নগর-প্রান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী গোরক্ষনাথ প্রিয়শিষ্য পূর্ণচন্দ্রকে সমস্ত কৌশল বুঝাইয়া দিলেন। পূর্ণচন্দ্র সশিষ্যে অবধূত-বেশে সমবেত রোগীদিগকে ঔষধ দান করিতে লাগিলেন। ঔষধের আশ্চর্য্যগুণে

মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই সুস্থ হইতে লাগিল। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি পারিষদাদি সমভিব্যাহারে অবধূতের নিকট উপস্থিত হইয়া ঔষধ সেবন করিলেন। ঔষধের আশ্চর্য্যগুণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নবজীবন লাভ হইল।

এ সময়ে লুনা ও তাহার পিতা জম্বু তথায় উপস্থিত ছিল। শালিবান লুনাকে অবধূতের নিকট পুত্র-বর চাহিতে অনুমতি করিলেন। লুনাও পুত্রবর চাহিল। অবধূত তখন, প্রথম পুত্র পূর্ণচন্দ্রের কথা রাজার স্মৃতিপথে উদয় করিয়া দিলেন। পরস্পরের কথা-প্রসঙ্গে ক্রমে সত্য বাহির হইয়া পড়িল। পূর্ণচন্দ্রের নির্দ্দোষিতা উপলব্ধি করিয়া, রাজা তখন "হা পুত্র—হা পুত্র" রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। শেষে পিতা-পুত্রের মিলন হইল। পাপিষ্ঠা লুনা নিজমুখে আত্মপাপ স্বীকার করিল; এবং সেবাদাসের উক্তিতে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়' ধ্বনি আকাশমার্গ ভেদ করিল। মহিষী ইচ্ছ্রা, পতিব্রতা সুন্দরা,—তখন সকলেই সেখানে উপস্থিত হইলেন। পুত্র পূর্ণচন্দ্রের কল্যাণে মাতা ইচ্ছ্রার নষ্টচক্ষুর উদ্ধার হইল। উন্মাদিনী ইচ্ছ্রা আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। বহু বিঘ্ন বিপত্তির পর, এই অভাবনীয় আনন্দমিলনে সকলেই সেই সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের প্রতি জয়ধ্বনি করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই চামার পিতা-পুত্রী স্ব স্ব পাপের প্রতিফল—অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে লাগিল। ধর্ম্মের জয় হইল। *

* কবি শ্রীগিরিশচন্দ্রের "পূর্ণচন্দ্র" হইতে সঙ্কলিত। পঞ্জাব অঞ্চলের সম্প্রদায়বিশেষের সেই "পূরণ্ ভকত্"ই আমাদের এই "পূর্ণচন্দ্র"।



ভক্তি ও ভক্ত।



ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা অপার্থিব রত্ন মানুষের আর কিছু নাই। এই অমূল্য নিধির কৃপায় মানুষ দেবতার অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী হয়। ভগবানের প্রতি জীবনের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণের নাম ভক্তি। বাহিরে ভক্তির কোন রূপ নাই,—ভক্তি হৃদয়ে। তাই প্রকৃত ভক্তকে, যে সে চিনিতে পারে না। সেই ভক্ত-বৎসল যে কা'র প্রাণে, কি ভাবে বিরাজ করেন, তাহা কেবল তিনি, আর তাঁর ভাগ্যবান সেবকেরাই বলিতে পারেন। উপস্থিত আখ্যায়িকাটিতে সেই কথাটিই বুঝিতে চেষ্টা পাইব।



(১)

একদা দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে ভগবান শ্রীহরির দর্শনাভিলাষে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে একটি সাধুপুরুষ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ও বেশভূষা মহাজনোচিত;—কৌপিন বসন পরিধান, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-পরিলেপিত, মস্তকে দীর্ঘ জটাজুট পরিশোভিত। পবিত্র শার্দ্দূল-চর্ম্মোপরি যোগাসনে উপবেশন করিয়া তিনি তন্ময়চিত্তে সেই সর্ব্বান্তর্য্যামীর ধ্যানে বিভোর,—সেই সচ্চিদানন্দ-প্রেমে আত্মহারা। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ হৃষ্টচিত্তে

উক্ত মহাজনবেশধারী, সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া, বিনয়-নম্র-বচনে নারদকে কহিলেন,—"দেবর্ষে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, ও পরম করুণাধার। সর্ব্বস্থানেই আপনার গতিবিধি আছে। যদি এ দীনের প্রতি কৃপা করিয়া, একবার ভগবানের নিকট এ দীনের একটি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, তবেই আমার সমস্ত কষ্টের সার্থক হয়। দেখুন, আমি সংসারাশ্রম,—ধন জন, স্ত্রী পুত্র—সমুদয় ত্যাগ করিয়া কেবলই তাঁহারই ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিতেছি,—তাঁহারই চিন্তায় ঐহিক সুখ তুচ্ছ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। অতএব যাহাতে তিনি সত্বরই আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আপনি সে বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন এবং আমার হইয়া দুইটা কথা তাঁহাকে বলিবেন।"

দেবর্ষি নারদ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, অবশ্য; তা'ত বটেই। তিনি পরম দয়ালু; তোমার এ ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের ফল কি নিষ্ফল হইতে পারে? আমিও তাঁহার দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠে যাইতেছি। তোমার হইয়া আমি সাধ্যানুসারে তাঁহাকে বলিব। বোধ করি, তাহা হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।"

সন্ন্যাসী, তাঁহার হইয়া ঠাকুরের কাছে সুপারিস করিতে, নারদকে কতই অনুনয়-বিনয় করিলেন; আকারে ইঙ্গিতে কতই কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন। নারদও তাঁহাকে যথাবিহিত আপ্যায়িত ও আশ্বস্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিছুদূর গমনের পর তিনি এক তিন্তিড়িবৃক্ষতলে এক অপবিত্র, অনাচারী, কুৎসিতমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই লোকটা নারদকে দেখিবামাত্র, তাহার সেই স্বাভাবিক উগ্রকণ্ঠে

কর্ক শস্বরে কহিল,—"বলি, তুমি না নারদ ঋষি? তুমি ত বৈকুণ্ঠে যাচ্ছ? আচ্ছা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রো দেখি, কত দিনে আমি তাঁকে পাবো?—কেমন, মনে থাকবে ত?"

দেবর্ষি তাহার ভাবগতিক দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার তপস্যার দৌড় বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে ঈদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া, মনে মনে একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আচ্ছা, তোমার কথাও বল্‌বো।"

"বড় 'আচ্ছা' নয়। না ব'লে কিন্তু টের্‌টা পাবে!"

মহামুনি নারদ আর কোন উত্তর না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"আহা, ভগবানের ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই, তিনি ঐ মূর্ত্তির জন্যে ভেবে ম'চ্ছেন আর কি!

(২)

যথাসময়ে দেবর্ষি বৈকুণ্ঠলোকে বৈকুণ্ঠপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এবং যথাবিহিত পরস্পরের স্বাগত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসাদির পর, নারদ পথিমধ্যে সেই বটবৃক্ষমূলস্থ, সন্ন্যাসীটির কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর! আপনি কি নিষ্ঠুর! আহা, যে আপনার জন্যে সমস্ত ধন বিভব, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়েছে,—আপনার ধ্যানজ্ঞান যার একমাত্র ব্রত, তার প্রতি আপনি একবার চেয়েও দেখ্‌চেন না! যা'হোক ঠাকুর, আপনি খুব দয়ালু!"

গোলকপতি নারায়ণ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্য-

ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নারদ, পথিমধ্যে তুমি আর কাহাকেও দেখেছ' ?"

"কৈ, আর কাহাকে ত বড় একটা দেখি নাই।"

"একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি,—আর কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল কি না ?"

নারদ একটু ইতস্ততঃ করিলেন। ক্ষণপরে কহিলেন,—"কৈ, আর ত কাহাকে দেখ্‌তে পাইনে।—তবে, হাঁ,—হাঁ,—একটা গুণ্ডাকৃতি ভণ্ড কিছু ব'লেছিল বটে; তা—তা—সে কথা আপনার শুনে কাজ নাই।"

"আঃ,—বল নাই কেন হে!"

"ঠাকুর, সে কথা শুনে আর আপনার কি হবে? সেটা কিছু নয়—কিছু নয়! সেটা একটা বিট্‌কেল, কিম্ভূতকিমাকার, কদাচারী জানোয়ার-বিশেষ। সে কিনা আমায় ব'ল্লে,—'ওরে, তোর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিস্, আমি ক'দ্দিনে তাঁকে পাব।'—রাম রাম!!"

"বলি, তার উপর অত চ'ট্‌চ কেন? সেত এ কথা জান্‌তে চেয়েছিল বটে!"

"আজ্ঞে হাঁ,—তা আপনার কাছে বল্‌তে ব'লেছিল বটে। কিন্তু সেটা যে আপনার কাছে বল্‌বার মত একটা কথা, তা আমি ভাবিনে। আর আমারও তা মনেও ছিল না। তবে হাঁ, ঐ সন্ন্যাসীটির বিষয় আমার কিছু বল্‌বার ছিল বটে।"

"আচ্ছা দেখ, এখন তুমি এক কাজ কর। তুমি এখনই আবার সেই পথে গিয়ে তাদের দু'জনকেই বলগে,—যে, যে গাছের তলায় আছে, তাকে সেই গাছের পাতার সংখ্যানুযায়ী

তত বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা কর্‌তে হবে, তবে আমাকে পাবে,—তবে আমি তাদের দেখা দেবো।"

---

(৩)

নারদও নারায়ণের কথামত ত্বরিতপদে পূর্ব্বোক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অগ্রে সেই সন্ন্যাসিবেশী মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সন্ন্যাসী হৃষ্টচিত্তে নারদকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাত্মন্, দীনের প্রার্থনা কি পূর্ণ হইয়াছে?"

নারদ একটু ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন,—"হাঁ বাপু, ভগবান বলিয়াছেন যে, এই বটগাছের যত পাতা, তত বৎসর যদি তপস্যা করিতে পার, তবে তিনি দেখা দিবেন। এর কমে তিনি কিছুতেই রাজি নন।"

সন্ন্যাসী। বুঝেছি,—যথেষ্ট হ'য়েছে বাবা! আর আমার তাঁকে পেয়ে কাজ নেই! আমি চল্লেম। এতদিন অন্য বিষয়ে মন দিলে আমার ঢের কাজ দেখ্‌তো! এই দণ্ডবৎ বাবা!"

এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ তল্পাপুঁটলি বাঁধিয়া তখনই তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন।

মহর্ষি নারদও একটু বিস্মিত হইয়া, আপন মনে "তাইত, একি" ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তির উদ্দেশে সেই তেঁতুল বৃক্ষের নিকটে আসিলেন। সে ব্যক্তি নারদকে দেখিয়াই তাহার সেই স্বাভাবিক রুক্ষস্বরে আগ্রহসহকারে কহিল,—"কেমন হে ঋষি, তুমি ত বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলে? আমার খবর কি? ঠাকুর কি ব'ল্লেন, বল দেখি।"

"মহর্ষি নারদ কহিলেন, "ঠাকুর এই কথা বলেন যে, তুমি যদি, এই তেঁতুল গাছের যত পাতা তত বৎসর তপস্যা করতে পার, তবে তাঁকে পাবে,—তবে তিনি তোমায় দেখা দিবেন।"

"এ্যাঁ! তাঁকে পা'ব? এই ক'ল্লে তিনি দেখা দেবেন ব'লে-ছেন? এই বই ত নয়! আচ্ছা, এই আমি আসন গেড়ে বস্‌লেম। তবে তাঁকে পা'ব একদিন?—আঃ! একদিন তবে তিনি দেখা দেবেন? দয়াময় হে!—"

এই বলিতে বলিতে সেই হৃদয়ে ভক্ত, বাহ্যাকারে 'ভেক' হীন মহাত্মা আনন্দবিভোর প্রাণে কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রেমের পূর্ণোচ্ছ্বাস রোধ করিতে তাঁহার আর সামর্থ্য রহিল না। তাই কাঁদিতে কাঁদিতে গদগদস্বরে কহিলেন,—"আঃ তবে তিনি দেখা দেবেন?—তাঁকে তবে আমি পাব? দয়াময় হে!—"

---

(৪)

ধন্য ভক্তি,—ধন্য ভক্তির মহিমা,—আর ধন্য ভক্তহৃদয়! এইবার ভক্তের চির আশা ফলবতী হইল; দ্বিগুণ উৎসাহে সেই পরম প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত যোগাসনে উপবেশন করিলেন। নারদ হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া, বৈকুণ্ঠে গিয়া বৈকুণ্ঠনাথকে কহিলেন,—"প্রভো! এ আপনার কেমন লীলা? অমন যে সাধু-বেশধারী ভক্ত,সে কিনা, বটগাছের অত বড় বড় পাতা দেখে তল্‌পী পুঁটুলি গুটিয়ে পালালো; আর, আমি যাকে পাষণ্ড মনে ক'রে অবজ্ঞা করেছিলেম, সেই কিনা, তেঁতুল গাছের অত ক্ষুদে ক্ষুদে পাতা দেখেও আনন্দে কেঁদে ফেলে ব'ল্লে—'আঃ! তিনি

তবে দেখা দেবেন! তাঁকে তবে আমি পাবো!' প্রভু, এই জন্যই কি তোমার নাম লীলাময়? হরি! হরি! কি অপূর্ব্ব লীলা! তোমার লীলায়, বটের অত বড় বড় পাতা দেখে এক জন ওঠে; আর তেঁতুলের অত ক্ষুদে ক্ষুদে পাতা দেখে একজন বসে! বলিহারি, তোমার মহিমা, প্রভু!—এ অধমও আজ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিল!"

ভগবান কহিলেন,—"দেখ নারদ, লোকের বাহ্যিক ক্রিয়া-কাণ্ড দেখিয়া ভুলিও না। লোকে যদি অন্তরের সহিত কোন অনুষ্ঠান না করে, তবে আমি তার ত্রিসীমায়ও যাই না। মনে রেখ', ভক্তির পাত্রাপাত্র নাই, ভক্তের মন বুঝিয়া আমি তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠান হই! এইজন্য কেহ কেহ মনকে নারায়ণ বলে। এখন যাও,—তুমি যাকে অতি-পাষণ্ড স্থির ক'রে রেখেছিলে, তাকে এখানে নিয়ে এস। তার জন্য আমার এখানে স্বতন্ত্র স্থান প্রস্তুত হইয়াছে।"

নারদ শ্রীভগবানকথিত মূল ভক্তিতত্ত্বের এই কণাংশ অবগত হইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন।

সমাপ্ত।





যমুনা।

(১)

একটি বালক, আর একটি বালিকা। দু'য়ে বড় ভাব, বড় ভালবাসা। জীবনের সেই ঊষাকাল হইতে, রবির প্রভাত-কিরণের সহিত, এই বালক-বালিকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ-কিরণ উদ্ভাসিত হইতেছিল। কেহ দেখিত না, কেহ জানিত না, দু'জনাই দু'জনার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতেছিল। মুহূর্ত্তের বিরহ কাহারও ভাল লাগিত না; কেহ কাহারও ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিতে পারিত না।

গঙ্গার ধারে, ছোট 'খেলাঘর' বাঁধিয়া, দুটিতে ক্রীড়া করিত, পুতুলের বিবাহ দিত, ফুল তুলিত, চাঁদ দেখিত, সন্ধ্যার জ্যোৎস্নালোকে গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট তরঙ্গগুলি উঠিত, তাহাই দেখিত। কত কথা, কত গল্প, কত হাসি! সেই গল্প ও হাসির মাঝে, কখন কখন নীরব হইয়া, দু'জনা দু'জনার মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিত। পরস্পর পরস্পরকে কত সুন্দর দেখিত! নির্ম্মল ভাবিত,—যমুনা কত সুন্দর! বুঝি, সেই চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল হাস্যময়ী প্রকৃতির শোভা, সে সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়! বুঝি, আপনার চিন্তাশূন্য, সুখপূর্ণ, নির্ম্মল ও সুন্দর হৃদয়টুকু, যমুনার সৌন্দর্য্যে নিষ্প্রভ! যমুনাও ভাবিত,—নির্ম্মল কত সুন্দর!

তেমন সুন্দর, সে বুঝি, পৃথিবীতে আর দেখে নাই। বালিকা আপনার রূপের রাশি দেখিতে পাইত না,—শ্যামবর্ণ নির্ম্মলের রূপ, তাহার কাছে জগতে অতুল! তাহারা কেহ কাহাকে এ কথা বুঝাইতে পারিত না; কিন্তু বাল্যকাল হইতে পরস্পর এইরূপ ভাবিত।

তখন কেহ বুঝিত না; কিন্তু এইরূপে দুইটি বালক বালিকার বড় সুন্দর ভাব হইল। ক্ষুদ্র খেলাঘরের মাঝে বসিয়া, ক্ষুদ্র হৃদয় দু'টির এমনই মিলন হইল। পুতুলের বিবাহ দিতে দিতে আপনারাও দিনের মধ্যে দশবার করিয়া বিবাহিত হইত! কে দেখিত? উপরে সুন্দর আকাশ, নিম্নে স্বচ্ছ-সলিলা গঙ্গা, গঙ্গাতীরে দু'একটি বৃক্ষ-বল্লরী,—তাহারাই দেখিত। বর, আপনিই পুরোহিত হইত, আপনিই সম্প্রদান করিত; ক'নে চক্ষু মুজিয়া, ঘোমটা দিয়া, আপনিই ক'নে সাজিত, আবার ক'নের মা হইয়া বরকে বরণ করিত! সংসারের সুখ-দুঃখ সেখানে ছিল না। শুধু কথা, শুধু হাসি, শুধু গান! নানা দুঃখে কাতর-প্রাণ হইয়া, কতবার তোমায় আমায় শৈশবের সেই খেলাঘর পানে নিরীক্ষণ করি! হায়, এ জীবনে তাহা আর মিলিবে কি?

বালক-বালিকার উষাকাল খুব পরিষ্কার!—আকাশ নির্ম্মল, হৃদয় প্রফুল্ল! জীবন-মধ্যাহ্নে, এ প্রফুল্লতা থাকিবে কি?

---

(২)

মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাট। ঘাটের অনতিদূরে একটি দ্বিতল বাটীতে যমুনার পিতা বাস করিতেন। তাঁহার আয় অতি

সামান্য ছিল; খরচও অল্প ছিল। পরিবারের মধ্যে যমুনা ও তাহার পিতা-মাতা, আর একটি পরিচারিকা ছিল। অন্য পুত্র সন্তান না হওয়ায়, যমুনা তাহার পিতা-মাতার বড় স্নেহ ও আদরের ধন ছিল। যমুনার অতুল রূপরাশি ও সরল হাসি-টুকু, তাঁহাদের বড় আনন্দের ছিল। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, ঈষদ্বক্র, অলকাগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে, চঞ্চল হরিণ শিশুর ন্যায়, যমুনা যখন তাহার পিতার কাছে ছুটিয়া আসিত, তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। যত্ন করিয়া তিনি কন্যাকে লেখা পড়া শিখাইতেন; কন্যাও রীতিমত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

নির্ম্মল বড় গরীবের ঘরের ছেলে। যমুনাদের বাটীর পার্শ্বে তাহাদের একখানি কুটীর ছিল। সেই কুটীর ও অট্টালিকার মাঝে, খুব উচ্চ এক প্রাচীর ছিল। বালকবালিকার হৃদয়ের মাঝে কিন্তু কোন ব্যবধান ছিল না। নির্ম্মল শৈশবেই পিতৃহীন হয়। এক মা ভিন্ন, সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না। পিতৃসঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, তাহাতেই মোটা ভাত-কাপড়টা এক রকমে চলিয়া যাইত। মায়ের যত্নে, নির্ম্মল দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

নির্ম্মলের তত রূপ ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের গুণে তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইত। সকলেই তাহার প্রশংসা করিত; শুনিয়া দুঃখিনী মায়ের চক্ষে জল আসিত। আর সে ক্ষুদ্র বালিকার? নির্ম্মলের প্রশংসা তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলের প্রতি যমুনার, এবং যমুনার প্রতি নির্ম্মলের ভালবাসা খুব বাড়িতে লাগিল। প্রণয় বলিতে হয়

বল,—এখন দুই জনে অবশ্য তাহা বুঝিত। যমুনার বয়স দ্বাদশ বর্ষ, নির্ম্মলের ষোড়শ।

প্রায়ই সন্ধ্যাকালে, মুঙ্গেরের গঙ্গাতীরে নির্ম্মল ও যমুনা বেড়াইত। অধিক লোকসমাগম হইলে, বালক-বালিকা নিভৃতে যাইত, কত গল্প করিত। কথা কি ফুরাইত? কোন গল্প কি পুরাতন হইত? বক্তা ও শ্রোতা, পরস্পর মুখের প্রতি চাহিলে, আর গল্প হইত না—দু'জনেই হাসিয়া ফেলিত। সেই জন্য একজন গল্প বলিত—মুখখানি ভূমিপানে নত করিয়া; আর একজন সতৃষ্ণ-নয়নে অপরের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিত। সমস্ত আন্তরিক বৃত্তি, দর্শনেন্দ্রিয়ে পর্য্যবসিত হইত; সুতরাং গল্পের দিকে মন থাকা অসম্ভব হইত।

কষ্টহারিণীর সোপানোপরি নির্ম্মলের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, সন্ধ্যাকাশ পানে চাহিয়া মধুর কবিতাগুলি, যখন তদধিক মধুর কণ্ঠে যমুনা বলিতে থাকিত, তখন সন্ধ্যা-সমীরণ-চঞ্চল লহরীর মধুর শব্দের সহিত সেই মধুর-কণ্ঠ মিশিয়া নির্ম্মলের হৃদয়ে সুখের প্রবাহ ঢালিয়া দিত।

"এত বড় আইবুড় মেয়ের, এমন করিয়া একটা 'ধেড়ে ছোঁড়ার' সহিত বেড়ান কি ভাল দেখায়? উপন্যাসে পড়ি বটে, এমন ঘটনা কিছু নূতন বা আশ্চর্য্যের নহে; কিন্তু তোমার-আমার ঘরের মেয়েছেলের কি এ সব ভাল দেখায়? ভালবাসা আছে, থাকুক; কিন্তু তাই বলিয়া আর অতটা হওয়া উচিত নহে,—সে বয়স গিয়াছে।"

একদিন কে, যমুনার পিতাকে এই কথা বলিল। তদবধি যমুনা আর বাটীর বাহির হইতে পারিত না। এই সময় হইতে

দুই জনের দেখাসাক্ষাৎ বড় কম ঘটিত। নির্ম্মল, পাঠে নিযুক্ত থাকিত; যমুনাও সংসারের দু'একখানা ছোট ছোট কাজে ব্যস্ত থাকিত। কেহ কাহাকে ভুলিয়াছিল কি? যমুনা ভাবিত,—নির্ম্মল তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব। নির্ম্মল ভাবিত,— জগৎ বিস্মৃত হওয়া যায়, কিন্তু সেই শৈশব সঙ্গিনী, হৃদয়ের অমূল্য নিধি যমুনা ভুলিবার নহে! হৃদয়-মন্দিরে যে দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে, সমস্ত জগতের বিনিময়েও তাহা বিস্মৃতি-গর্ভে বিসর্জ্জিতা হইতে পারে না।

এই ভাবে কিছুদিন গেল।

---

(৩)

যমুনা বয়ঃস্থা হইয়াছে, অনূঢ়া রাখা আর ভাল দেখায় না; সম্বন্ধ হইতে লাগিল। যমুনা, পিতা-মাতার বড় আদরের ধন, খুব সৎপাত্রেরই চেষ্টা হইতে লাগিল। সৎপাত্র মিলিল বটে, কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ দিলে সে পাত্রে কন্যাদান হইতে পারে, যমুনার পিতার সে সঙ্গতি ছিল না। তিনি অর্থপ্রদানে অসমর্থ হইলেন, সুতরাং পাত্রও হাত-ছাড়া হইল। টাকা নাই বলিয়া, লক্ষ্মীছাড়া পাত্রের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিতে, কোন্ পিতা পারত-পক্ষে স্বীকৃত হন?

সকলে জানিত এবং বুঝিলও যে, যমুনা ও নির্ম্মল, পরস্পরকে বড় ভাল বাসে; দু'জনের বিবাহ হইলে, দু'জনেই সুখী হইবে; কিন্তু যমুনার পিতা বা মাতা, কাহারও সে ইচ্ছা ছিল না। নির্ম্মল,—সচ্চরিত্র, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান; কিন্তু নিঃস্ব। সহায়

নাই, সম্পদ নাই, কি দেখিয়া কন্যাদান করা যায়? কাজেই তাহা হইল না। যমুনা সে কথা শুনিল।

নির্ম্মলও তাহা শুনিল। কথাটা নূতন কি? তা' নহে,—নির্ম্মলও তাহা ভাবিত। তাহার মাতার বড় সাধ ছিল, যমুনাকে বধূ করেন। কিন্তু অবস্থার হীনতায় সে আশা পূর্ণ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব, তাহাও জানিতেন। নির্ম্মলও সে সব বুঝিত। কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া, কে কবে, ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিতে পারিয়াছে?

যাহা হইবার, তাহাই হইল। যমুনার বড়ই ভাবান্তর ঘটিল। নির্ম্মলের ম্লান মুখখানি, তাহার হৃদয়ের সকল অবস্থাই ব্যক্ত করিল। বালিকার বুকে সে আঘাত লাগিল।

মায়ের প্রাণে লাগিল। কিন্তু পিতা বলিলেন,—"বালক-বালিকার এ প্রকার ভাব, বয়সের একটা পিপাসা মাত্র। পরস্পরকে যদি পৃথক্ রাখা যায় ও দেখা সাক্ষাতের সুবিধা না দেওয়া হয়, তবে এক দিন, দুই জনেরই হৃদয় হইতে এ ভাব অপসৃত হইতে পারিবে।"

এই ভাবিয়া তিনি নির্ম্মলকে আর বাটীতে আসিতে দিতেন না, কিংবা কন্যার সহিত দেখা করিতেও দিতেন না। কিন্তু তাহাতে হইল কি? বাধা পাইয়া যেমন নদী স্রোত দ্বিগুণবেগে বাধা অতিক্রম করে, ইহাও সেইরূপ হইল। বস্তুতঃ আকর্ষণটা যেন দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠিল। জীবনের এত খানি পথ এমনি ভাবে আসিয়া,কে কাহাকে ভুলিতে পারিয়াছে? দেখা করিতে দাও বা না দাও, হৃদয় হইতে এ স্মৃতি মুছিবার নহে। কালে সবই যায় সত্য, কিন্তু ইহার উপর কালের আধিপত্য কতটুকু?

দেখা হইত না বটে, কিন্তু কোন মুহূর্ত্তে কেহ কাহারও চিন্তাশূন্য থাকিত না। তাহাদের যে গভীর ভাবনা, তাহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু এখন হইতে, দু'জনাই দু'জনার আশা ছাড়িল।

---

(৪)

বর মিলিল। সুবোধচন্দ্র নামে বিংশতিবর্ষীয় এক যুবা, যমুনার রূপে মোহিত হইয়া, বিনা পয়সায়,—এমন কি, ঘর হইতে সকল খরচপত্র করিয়া,—অধিকন্তু যমুনার পিতাকে কিছু নগদ দিয়া, বিবাহ করিতে সম্মত হইল। সুবোধ,—ধনীর সন্তান; লেখা-পড়ায় যদিও তত অনুরাগ নাই, তবে বুদ্ধিহীন নহে। পাত্রের রূপ আছে, ধন আছে, একটা 'ঘরানা ঘরের' ছেলেও বটে,—সুতরাং পিতা-মাতার বড়ই আনন্দ হইল এবং যমুনার বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

ক'নে দেখা হইল। যমুনার রূপের রাশি সুবোধ দেখিল,—জগতে অতুল। সুবোধ, তাহাদেরই প্রতিবাসী; অনেকবার সুবোধ,—যমুনা ও নির্ম্মলকে দেখিয়াছে, তাহারাও সুবোধকে দেখিয়াছে। এক দিন—তখন যমুনার বয়স দশ বৎসর,—সাঁতার দিতে দিতে যমুনা, গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছিল; ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গার মাঝামাঝি একটা নিমজ্জিত পাহাড়ের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল; নির্ম্মল আপনার পৃষ্ঠের উপর যমুনাকে লইয়া আসিতে আসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সুবোধ সে দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের দু'জনেকেই তুলিয়া আনিল। বালিকা ধীরে ধীরে তীরে উঠিয়া মনে মনে সুবোধকে ধন্যবাদ দিয়াছিল।

কি করুণ-নয়নে সে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল! সুবোধ সেদিন যমুনাকে কত সুন্দর দেখিয়াছিল। সুবোধের তখন বিবাহের কথা হইতেছিল। কিন্তু সেই গঙ্গাস্রোতে ভাসমানা দশম-বর্ষীয়া বালিকা যমুনার স্বর্গীয় রূপরাশি তাহার মনে জাগিতে ছিল। সুতরাং অন্যত্র বিবাহ করিতে সুবোধের ইচ্ছা হইল না। কিন্তু সকলে এইরূপ বুঝিত যে, নির্ম্মল ও যমুনায় যখন এত ভাব ও ভালবাসা, তখন উহারাই একদিন পরস্পর পরস্পরের বর ক'নে হইবে। সুবোধ এক প্রকার নিরাশও হইয়াছিল। আজ আবার প্রায় তিন বৎসর পরে,সেই যমুনার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল! সুবোধের আর আনন্দের সীমা নাই।

ক'নে দেখার দিন, সুবোধের সেই পূর্ব্ব স্মৃতি বড় উজ্জ্বল-রূপে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। যমুনার সেই গঙ্গায় ভাসিয়া যাওয়া আজ তিন বৎসরের কথা;—এই তিন বৎসরে যমুনার রূপ আরও কত বাড়িয়াছে! মুখখানি মলিন এবং প্রশান্ত চক্ষু দুটি অপ্রফুল্ল সত্ত্বেও সুবোধ তাহা আরও সুন্দর দেখিল। বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল।

সুবোধ কি জানিত না যে, যমুনা নির্ম্মলকে কত ভালবাসে? জানিত বৈ কি;—সকলেই জানিত। কিন্তু যমুনার পিতা মাতার ন্যায়, সুবোধও ভাবিল যে, তাহার সহিত বিবাহ হইয়া গেলে, যমুনা নির্ম্মলকে অবশ্যই ভুলিবে।

---

(৫)

একজন কেবল ভুলিল না। যমুনাদের যে পরিচারিকা ছিল, সেই কেবল বুঝিল অন্যরূপ। পরিচারিকার নাম ছিল লক্ষ্মী;

বয়স ২৪।২৫ বৎসর, শ্যামাঙ্গী। লক্ষ্মী, ভদ্রঘরের মেয়ে, শৈশবে পিতৃ মাতৃহীনা হইয়া, দূর-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের নিকট থাকিত। তাহারা বিবাহ দেয়। বিবাহের কিছুদিন পরেই বিধবা হইয়া দারিদ্র্যের কণ্টকাকীর্ণ মুকুট মাথায় পরিয়া, লক্ষ্মী এই গৃহের পরিচারিকা হইল। সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিত, আহারান্তে, রাত্রে শয্যায় শুইয়া, প্রতিরাত্রেই সে, কে জানে কেন, কাঁদিত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিত, মাথার বালিস জলে ভিজিয়া যাইত। তাহার দুঃখ সেই বুঝিত; আর বুঝিত, তাহার হৃদয়ের দেবতা।

লক্ষ্মীর সুখ দুঃখের ভাগী ছিল—যমুনা। যমুনাকে সে, আপনার ভগিনীর মত ভালবাসিত; দু'য়ে খুব প্রীতি ছিল। লক্ষ্মীর প্রকৃত পরিচয় কেবল যমুনাই জানিত। লক্ষ্মী সে কথা আর কাহাকেও বলে নাই,—যমুনাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছিল। দু'জনাই দু'জনার ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী। কেহ কাহারও কাছে কোন কথা লুকাইত না। তাই লক্ষ্মী বুঝিয়াছিল, – যমুনা নির্ম্মলকে ভুলিতে পারিবে না;—যদি সুবোধের সহিত যমুনার বিবাহ হয়, তবে যমুনা সুখী হইতে পারিবে না।

লক্ষ্মী, যমুনাকে সান্ত্বনা করিত, আশাও দিত; কিন্তু যমুনার মন বুঝিত না।

যখন সুবোধ ও যমুনার বিবাহ ঠিক হইয়া গেল, তখন সকল আশাই নির্ম্মূল হইল। যমুনা কাঁদিল, লক্ষ্মীও কাঁদিল। লক্ষ্মী ক ভাবিল, বলিল,—"তুমি নিশ্চিন্ত হও, এ বিবাহ কখনই হইবে না।"

যমুনা একথা, এ সময় বিশ্বাস করিতে পারিল না,—মন

প্রবোধ মানিল না; লক্ষ্মীর ক্রোড়ে মুখ রাখিয়া, আরও কাঁদিতে লাগিল।

আমরা বালক-বালিকার জীবনের সেই উষাকাল খুব নির্ম্মল দেখিয়াছিলাম। জীবন-মধ্যাহ্নে তাহাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল! কে জানে, এ মেঘ কখন অপসৃত হইবে কি না!

---

(৬)

নির্ম্মলের বড় ভাবনা হইল; আর কি কোন আশা নাই? কাজ-কর্ম্ম ভাল লাগে না, লেখা-পড়ায় মন নাই, কোন কিছু-তেই স্পৃহাও নাই। পুত্রের এ অবস্থা দেখিয়া, মাতা চিন্তিতা হইলেন; কিন্তু তিনি আর করিবেন কি?

অতীতের কত কথা নির্ম্মলের মনে পড়িল। সেই শৈশব কাল, সেই গঙ্গাতটে খেলাঘর, সেই ক্রীড়া, সেই গল্প, সেই পুতুলের বিয়ে, তার পর আপনাদিগের বিবাহ,—সে কতদিনের কত কথা নির্ম্মলের স্মৃতিমাঝে জাগিয়া উঠিল। দুইজনের বিবাহ হইলে কোথায় বাড়ী করিবে, কেমন থাকিবে, কত ভালবাসিবে,—একে একে তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে, নির্ম্মল সুখ-শান্তি-হারা হইল।

সন্তানের দুঃখে মায়ের প্রাণ কাঁদিল। মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া, নির্ম্মলও দুঃখিত হইল। এবার সে মনে মনে বলিল,—"আর এমন করিব না,—যমুনাকে ভুলিব।"

কিন্তু চেষ্টা করিয়া কে কাহাকে ভুলিতে পারে? ভুলিবার চেষ্টাই ভুলিবার প্রধান অন্তরায়। নির্ম্মলের মাতা নির্ম্মলকে

কিছুদিন মাতুলালয়ে যাইতে বলিলেন। নির্ম্মলও স্বীকৃত হইল; কিন্তু যাইবার আগে যমুনার সহিত কি একবার দেখা হয় না?

দেখা হইল, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য। যমুনা কাঁদিল না;—কিন্তু কাঁদিলে বুঝি ভাল হইত।

কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে মর্ম্ম-ভেদী কাতর দৃষ্টি, সে অন্তরের ব্যথা, সে নিরাশার দীর্ঘশ্বাস, বুঝিবার,—বুঝাইবার নহে।

দেখিতে দেখিতে উভয়ের চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। নির্ম্মল রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"যমুনা! ইহকালে আমরা সুখী হইলাম না, পরকালে আমাদের সুখ আছে। জীবন অনন্ত, কালও অনন্ত। কোন জীবনে, কোন কালে কি তোমাকে পাইব না? সেই আশায় বাঁচিয়া রহিলাম।"

যমুনা কোন উত্তর করিল না,—উত্তর করিতে পারিল না; মনে মনে কহিল,—"বুঝিয়াছি, আমার মৃত্যু সন্নিকট। নির্ম্মল! কেন তোমাকে এত ভাল বাসিয়াছিলাম?"

নির্ম্মল জানিল না, তাহার পশ্চাতে নিশ্চল স্থির প্রতিমার মত যমুনা দাঁড়াইয়া রহিল। যতদূর দেখা গেল, যমুনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নির্ম্মলকে দেখিতে লাগিল। যখন নির্ম্মল চক্ষের অন্তর্হিত হইল, সহকারভ্রষ্ট মাধবীলতার ন্যায় যমুনা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল!

---

(৭)

যমুনার মাতা ক্রমে সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন, কন্যার সুখ আর হইবে না। তখন স্বামী স্ত্রীতে ভাবিলেন। কিন্তু অনেক

বিলম্বে সে ভাবনা আসিয়াছিল। সুতরাং কোন ফল দর্শিল না। যমুনার পিতা বলিলেন,—"দূর হউক, আর ওকথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি ত সৎপাত্র দেখিয়া কন্যাদান করি, তার পর মেয়ের অদৃষ্টে যা' থাকে। তুমি কি মনে কর, মেয়ে আমার 'কোর্টসিপ' করিয়া বিবাহ করিবে, আমি তাহাতেই মত দিব ?"

"তা কে বলিতেছে ? কিন্তু যখন ব্যাপার সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখন আর অন্য উপায় কি ? আমি বলি, তবে এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দাও; আমি ত বুঝাইতে বাকি রাখি নাই, যমুনার সঙ্গিনীরাও যমুনাকে কত বুঝাইয়াছে, কিন্তু সেত তাহা কানে নেয় না। শেষ কপালে কি আছে, কে জানে ?"

"যা থাকে থাক্, ওকথা আর ভাবিও না। যুবক যুবতীর আবার ভালবাসা! চক্ষেই তাহার উৎপত্তি, চক্ষেই তাহার সমাপ্তি!—আমি অনেক দেখিয়াছি, তুমিও দেখিবে।"

যমুনা আর কাঁদে না, বুক বাঁধিয়াছে। নীরবে, নিভৃতে বুকটা কিন্তু এক বার হুহু করিয়া উঠিত। সে সময় বালিকা, কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে,—"হে দেব! আমায় বল দাও!

আর নির্ম্মল ?—হতভাগ্যের জীবন্তে সমাধি হইল। লক্ষভ্রষ্ট হইয়া, অবিরাম সে একটা মহাশূন্য অনুভব করিতে লাগিল।

নির্ম্মল এক্ষণে মাতুলালয়ে। মধুপুরের সুন্দর পাহাড়শ্রেণী তাহার কাতর প্রাণে কখন কখন কিছু শান্তি দিতে পারিত। নির্ম্মল দেখিত,—পাহাড়গুলির উপর স্থানে স্থানে শ্যামল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগাছ গুলি বড় সুন্দর। কৃষকদিগের দু'একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, পাহাড়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া আছে। কোন কুটীরের

চালাখানি ঢাকিয়া, মাধবীবল্লরী গুলি বুকে বুকে জড়াইয়া, অনেক প্রাসাদ অপেক্ষাও, সে কুটীরের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। চন্দ্রকিরণ, পাহাড়ের উপর নিপতিত হওয়ায় বড় সুন্দর শোভা হইয়াছে।

নির্ম্মল পাহাড়ের উপর বসিয়া এই সব দেখিতে দেখিতে, কিছু অন্যমনস্ক হইত। ভাবিত,—"আমি দরিদ্র বলিয়া, হৃদয়ের অমূল্য রত্ন লাভে বঞ্চিত হইলাম! কেন, কখন কি ধন উপার্জ্জন করিতে পারিব না? না পারি, এই যে সুন্দর স্থান, সুন্দর কুটীর, এমনি স্থানে, এমনি একটি কুটীর বাঁধিয়া, কি তাহাকে লইয়া, থাকিতে পারিতাম না? উপরে ঐ নির্ম্মল আকাশ, এই নির্জ্জন স্থান, এমন পাহাড়শ্রেণী, এমন বৃক্ষরাজী, এই কুটীর-গুলি,—কেন, ইহা অপেক্ষা কি অট্টালিকা সুন্দর? এই বিলাস-আড়ম্বরশূন্য, স্বার্থ-মলিনতা-হীন, সরল-হৃদয় দরিদ্র কৃষকগণের এ অবস্থা কি ঘৃণিত? যমুনাকে লইয়া এ পর্ণকুটীরে বাস করি-লেও আমি স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম। হায়, কোন্ পাপে, কার অভিশাপে, আমি সে দেবী-প্রতিমায় বঞ্চিত হইলাম! দীননাথ! জন্ম-জন্মান্তরেও কি সে ধ্রুবজ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইব না?"

চক্ষে জল আসিল। নির্ম্মল এমনি করিয়া কত রাত্রি অতি-বাহিত করিত। ভুলিতে কি পারিত? প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া একটি বাগানে ভ্রমণ করিত। দেখিত,—একটি কামিনী বৃক্ষতলে বসিয়া,বালক-বালিকাগণ ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতেছে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার কণ্ঠে কুসুমহার পরাইতেছে; বিনিময়ে কেহ কুসুমহারের ন্যায় কোমল স্নেহভরে তাহাকে

আলিঙ্গন করিয়া অব্যক্ত মধুর আলাপনে পরিতৃপ্ত করিতেছে; কেহ বা সুধাসঙ্গীতে মধুর কণ্ঠ তুলিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেছে! দেখিয়া, বাল্যের সেই অতীত ইতিহাস নির্ম্মলের স্মৃতিমাঝে জাগিত, আর নির্ম্মল নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু মুছিত!

---

(৮)

যেদিন যমুনা ও সুবোধের বিবাহ, সেদিনে কি বিঘ্নবশতঃ বিবাহ রহিত হইল। সে দিনের পর সাত দিন গিয়াছে।

আজ বিবাহ। সুবোধ ধনীর সন্তান; খুব সমারোহ, খুব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। ক'নের বাড়ীতেও ধুম কম নহে। খরচটা ত যমুনার পিতার নহে,—বরেদেরই সব। এত সমারোহ হইলেও, যমুনার পিতা মাতা কিন্তু বড় প্রফুল্ল নহেন। শ্রাবণের মেঘের মত কন্যার সে মলিন মুখখানি দেখিয়া, কাহারও তেমন আনন্দ নাই। তাঁহারা বুঝিলেন,—কাজটা ভাল হইল না। কিন্তু ভাবিবার আর সে সময় নাই,—বর আসিয়াছে।

যমুনা আগে বরং ভাবিত। বিবাহের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সে তত দৃঢ় হইল; কিন্তু ভুলিতে পারিল না। প্রফুল্ল থাকিতে চেষ্টা করিত,—পারিত না। বাটীর পার্শ্বে নির্ম্মলদের সেই কুটীর খানি দেখিয়া, সেই বড় করুণ আঁখি দু'টি জলে ভাসিয়া যাইত। নির্ম্মল কোথায় গিয়াছে, কেমন আছে;— লোকে বলিত, সে পাগল হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে—যমুনা সেই সব ভাবিত। তাহারই জন্য নির্ম্মল পাগল? হায়, তাহার মায়ের দশা তবে কি হইবে? তিনি কি কিছু শুনিয়াছেন? নির্ম্মল কি তবে মধুপুরে নাই?

জলে চক্ষু ভাসিয়া ছিল, এখন জলে বুক ভাসিতে লাগিল। তখন সরলা বালিকা, যুক্তকরে—উর্দ্ধনেত্র হইয়া, সন্ধ্যাকাশ পানে চাহিয়া, কাহাকে কি জানাইল। হায়, দেবতাও কি বালিকার সে মর্ম্ম-কাতরতা শুনিলেন না?

যমুনা এইরূপ করিত। আর ব্যথার ব্যথী লক্ষ্মা?—সে দিনরাত কি ভাবিত, মাঝে মাঝে যমুনাকে সান্ত্বনা করিত। বিবাহের দিন প্রাতে লক্ষ্মা শুনিল,—নির্ম্মল তাহার বৃদ্ধ মাতা-মহীকে লইয়া মুঙ্গেরে আসিবে ও তথা হইতে মাতাকে লইয়া, সকলে কাশীযাত্রা করিবে। সকলে বলিত, নির্ম্মল পাগল হইয়াছে; কিন্তু তাহার মাতা সে কথায় বিশ্বাস করিতেন না। সেইদিন মধ্যাহ্নে নির্ম্মল আসিল। কি জানি, লক্ষ্মা কেবলই সংবাদ লইতেছে,—নির্ম্মল আসিয়াছে কি না। যখন নির্ম্মলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহার বড় আনন্দ হইল। লক্ষ্মীর ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল,—যমুনার সহিত নির্ম্মলেরই বিবাহ হইবে। কিন্তু পরদিন প্রাতে কাশীযাত্রা হইবে, সব ঠিক হইল। নির্ম্মল, তাহার মাতা, দিদীমা ও এক গুরুপুত্র,—এই চারিজনে যাইবেন। নির্ম্মল ভাবিল,—মুঙ্গের হইতে তাহার দোকান পাট জন্মের মত উঠিল।

মাতা ভাবিলেন,—"কাশীতে যাইয়া ছেলের একটি বিবাহ দিব।—ছেলে বয়সে এমন ভাবিতেও আছে?"

অতি অল্প সময়ের জন্য লক্ষ্মা আসিয়া নির্ম্মলের সহিত দেখা করিল। নির্ম্মল যমুনার অবস্থা বুঝিতে পারিল। লক্ষ্মী ভাবিয়াছিল, যমুনা যেরূপ নিরাশায় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে,—নির্ম্মল পুরুষ মানুষ, বুকে আঘাত লাগিবে বটে, কিন্তু অতটা

হতাশ হইয়া পড়িবে না; সুবোধের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলে, না জানি কি হইতে পারে! সে যদি শুনিতে পায় যে, কোমলা হরিণীর বুকে সে কি মহাশেল নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা হইলে কি সে এমন কাজ করিতে পারিবে?

লক্ষ্মীর শেষ আশা এই! নির্ম্মলের হৃদয়ে সে কথা স্থান পাইল না! বিষাদপ্রতিমার সে ম্লান ছবি তাহার নয়ন সমক্ষে জাগিতে লাগিল! চাহিয়া চাহিয়া নির্ম্মল উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে বলিয়া উঠিল,—"যমুনা, যমুনা! তুমি আমার! কাহার সাধ্য, তোমাকে গ্রহণ করে!"

কিন্তু হায়, বিধাতার মনে অন্যরূপ ছিল!

---

(৯)

এ দিকে বিবাহসভায় বর আসিয়াছে। লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে আলো আর ফুল; গান আর বাজনা। বৈশাখ মাসের শুক্লাদশমী তিথি; জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক প্রফুল্ল। আনন্দ-কোলাহলে বিবাহবাড়ী পূর্ণ।

এইবার কন্যা সম্প্রদান হইবে, যমুনাকে বিবাহ স্থানে আনা হইল। অমনি চারিদিকে "ক'নে দেকি" "ক'নে দেখি" রব উঠিল। একজন যমুনার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিল। সকলে দেখিল,—সুন্দর রূপ, চাঁদপানা মুখ। কিন্তু কেহ দুঃখিত হইল, কেহ আশ্চর্য্য হইল,—যমুনার চক্ষে জল! এমন শুভ দিনে, হায়, একি অমঙ্গল!

এই সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—উদ্ভ্রান্ত বেশে নির্ম্মল

সেই সভা মাঝে উপস্থিত। মুখে কথা নাই, চক্ষে পলক নাই,—কি এক গম্ভীর ও স্থির প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ভাব। সকলে পাগল বলিয়া জানিত; কেহ দুঃখ করিল, কেহ বা উপহাস করিল। নির্ম্মল, চিত্রার্পিত স্থির নেত্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিল, শেষে কাঁদিয়া উঠিল। শৈশবসঙ্গিনী, হৃদয়ের অমূল্য নিধি আজ সে হারাইতে বসিয়াছে। এ হারানিধি কি সে আর পাইবে?

এইবার সকলে দুঃখ করিল, দু'একজন সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে জলও দেখা দিল। নির্ম্মল উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"যমুনা! যমুনা! দেখ দেখ, এই আমার বিবাহ!"

দেখিতে না দেখিতে, চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে, শাণিত ছুরিকা লইয়া নির্ম্মল আপন বক্ষে বসাইয়া দিল। বিবাহ-সভায় রক্ত-গঙ্গা বহিতে লাগিল।

"সর্ব্বনাশ" "সর্ব্বনাশ" রবে চারিদিকে গোল পড়িল। যমুনার পিতা ধূল্যবলুণ্ঠিত নির্ম্মলের রক্তাক্ত দেহ আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

(১০)

কেহ বলিল,—"ধন্য ভালবাসা!" কেহ বলিল,—"পাগল হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, তাই এমন কাজ করিল!" নির্ম্মল চক্ষু মেলিল, ক্ষীণকণ্ঠে জল প্রার্থনা করিল। জল দেওয়া হইল। শেষমুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, যন্ত্রণা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে মন্দভাগ্য বলিল,—"জন্মের শোধ একবার তাহাকে দেখাও,—একবার কাছে আসিতে দাও।"

পুরোহিত নিষেধ করিলেন; কিন্তু সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিল; মৃত্যুকালে একবার দেখাইতে হানি নাই।

পিতার আজ্ঞাক্রমে যমুনা তথায় আনীতা হইল। অল্প অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া, নির্ম্মলকে তদবস্থায় দেখিল। চারিচক্ষের মিলন হইল। যমুনা কাঁদিল না,—তাহার অন্তরের অন্তরে যে অশ্রু প্রবাহিত হইল, বাহিরে তাহা প্রকাশ হইল না!

সকলেই যমুনার পিতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অতৃপ্তলোচনে নির্ম্মল, যমুনার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে বলিল,—"যমুনা! আমি চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, সুবোধকে বিবাহ করিয়া তুমি সুখী হও। আমাকে জন্মের মত ভুলিয়া যাও। আমি মরিতাম না, মুহূর্ত্তের চাঞ্চল্যে কেমন হইয়া গেলাম! এই শাণিত ছুরিকা অনেক দিন হইতেই আমার হাতে ছিল। কিন্তু তোমার মুখ মনে পড়িলে আমার আবার বাঁচিতে সাধ যাইত। তাই মরি মরি করিয়াও মরিতে পারি নাই। বোধ হয় আজিও মরিতাম না। কিন্তু বুকের ভিতর কেমন একটা অসহ্য যাতনা হওয়ায় এমন কাজ করিলাম।"

তার পর হতভাগ্য অতি কষ্টে, আরও অধিকতর যাতনা জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"হায়' দুঃখিনী মা আমার! এই অন্তিম সময়ে তোমার কথা মনে জাগিল! মাগো, তোমার বুকে শেল দিয়া গেলাম! দয়াময়ি, পরমেশ্বরি! অধম সন্তানকে ক্ষমা করিও,—শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম!"

নির্ম্মলের সেই নিষ্প্রভ চক্ষে আবার জলধারা বহিল। আবার অতি কষ্টে কহিল,—"যমুনা! আজ তের বৎসর ধরিয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছি; আপনার সহিত কত সংগ্রাম করিয়াছি; শেষে

মরিয়া জুড়াইলাম! হায়, আমার অর্থহীনতায় আমাদের মিলন হইল না! কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন? মনে রাখিও, সেই সর্ব্বান্তর্যামী আমার অন্তর দেখিতেছেন;—তিনি জানেন, তুমি আমার, আমি তোমার। আমাদের এ জগতের সম্বন্ধ ঘুচিল বটে,—কিন্তু দেবতার সৃষ্ট আর এক রাজ্য আছে,—যেখানে পরজন্মে তোমার আমার মিলনে কেহ বাদী হইতে পারিবে না। কাল পূর্ণ হইলে তুমি সেই লোকে গিয়া আমার সহিত মিলিত হইও।"

নির্ম্মল হস্ত প্রসারণ করিল, যমুনা সে উত্তপ্ত হস্তের উপর আপনার হস্ত দিল। নির্ম্মল সে হস্ত আপনার বুকের উপর রাখিয়া কাতরস্বরে কহিল,—"যমুনা! বাল্যকালের সে খেলা মনে পড়ে কি? সেই বিবাহ?—আজও আমাদের বিবাহ!"

পুরোহিত বলিলেন,—"নির্ম্মল! তোমার মত হতভাগা আমি জীবনে দেখি নাই। আশীর্ব্বাদ করি, পরকালে সুখী হইও।"

তখনও নির্ম্মল ও যমুনা হাতে হাত দিয়া আছে। ক্রমশঃ নির্ম্মলের চক্ষু স্থির হইয়া আসিল; জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হইল।

যমুনা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

পুরোহিত বলিলেন,"আজ আর কন্যা সম্প্রদান হইবে না।"

যমুনার পিতা কহিলেন,—"আর কন্যা-সম্প্রদানে কাজ নাই,—আজ হইতে আমার কন্যা বিধবা!

সমাপ্ত।

